প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩০ ❖ ২৭ আগস্ট - ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

অনন্য সাধারণ গুণাবলীর অধিকারী ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী

নিবেদিত জীবনে উজ্জ্বল এক নক্ষত্র সিস্টার মেরী তেরেজা

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী'র ৪৬তম মহাপ্রয়াণ দিবস পালন

শ্রদ্ধাভাজন প্রিয়জনেরা,

সবাইকে জানাই খ্রিস্টীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে **আগামী ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার রমনা সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল গির্জায় বাংলাদেশ মণ্ডলীর গৌরব ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী'র ৪৬ তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হবে।** পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই এই উপলক্ষ্যে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করবেন। এই বিশেষ দিনের অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাই।

যারা দূরদূরান্তে আছেন ঐদিনটিতে এই মহান সাধকের স্মরণ দিবস পালন ও বিশেষ প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ও গর্বিত কেননা ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীই ইতিহাসে প্রথম বাঙালি যিনি সাধু শ্রেণীভুক্ত হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর জন্য আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি।

অনুষ্ঠান মালা

বিকাল ৪ টায়	-	গাঙ্গুলী মিউজিয়াম উদ্বোধন
৪:৩০ মিনিট	-	জীবন সহভাগিতা
৪:৪৫ মিনিট	-	জীবনালেখ্য ভিডিও চিত্র প্রদর্শন
৫ টায়	-	পবিত্র খ্রিস্টযাগ
৬ টায়	-	কবর আশীর্বাদ ও শ্রদ্ধা নিবেদন

ধন্যবাদান্তে—

আর্চবিশপসহ রমনা সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল ও আর্চবিশপস্ হাউজের ফাদারগণ

বিজ্ঞ/২৫৪/২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ৩০
২৭ আগস্ট - ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
১২ - ১৮ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

নম্রতা ও সেবাময় জীবন-যাপনে মানুষ হয়ে উঠে দেদীপ্যমান

বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর উজ্জ্বল নক্ষত্র, আপন জীবন ও কর্মে দ্যুতিময় এক ব্যক্তিত্ব আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী। ২ সেপ্টেম্বর ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মহাপ্রয়াণ দিবস। তিনিই এই উপমহাদেশে প্রথম বাঙালি বিশপ এবং আর্চবিশপ। মহান তাপস এই মহীয়ান মানবের সান্নিধ্যে যারা এসেছেন, তারা তাঁর পবিত্র জ্ঞানালোকে আর ভালোবাসার পরশ পেয়েছেন। তাঁর মধুমাখা সুমিষ্ট কথা, হাসি, অমায়িক শিশুসুলভ ব্যবহার, বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতা, অন্তরাত্মার পবিত্রতা আমাদের অনুপ্রেরণা ও শক্তি দান করে আজও। আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর জীবন কর্মই তাঁকে মহৎ করে তুলেছে, করেছে ঈশ্বরের সেবক। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি ঈশ্বরের সেবক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। সমস্ত ভক্তকূল তাঁর সাধু হওয়ার প্রতীক্ষায় এমন নিরহংকার, নির্মোহ অমায়িক, বন্ধুভাবাপন্ন মানুষ, যাকে দেখলেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। তাঁর কথায় ছিল আবেগমাখা সম্মোহনী শক্তি। অগাধ পাণ্ডিত্য পরিপূর্ণ মানুষটিকে তাঁর নম্রতাই তাঁকে মহান করে তুলেছে। মা-মাটি-মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ। তিনি ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত এক ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ এবং যুদ্ধোত্তর দেশ পুনর্গঠনে তাঁর অবদান স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে। এই নবযুগের মেষপালকের আলোকচ্ছটায় অনেক মানুষ আলোকিত হয়েছে, অনুপ্রাণিত হয়েছে। তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অমূল্য সম্পদ। মহাজ্ঞানী ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপুষ্ট এই ধর্মগুরু সাধুশ্রেণীভুক্তকরণের প্রথম ধাপে রয়েছেন। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ধাপগুলি উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ধন্য ও সাধু হয়ে ওঠবেন এমন প্রত্যাশা আমাদের সকলের। তবে তার জন্য আমাদের প্রচুর প্রার্থনার প্রয়োজন। এ জন্য চাই আরও প্রচারণা। মানুষ তার সম্বন্ধে যত বেশি জানবে ততো বেশি তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে। আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ৪৬ তম প্রয়াণ দিবসে তাঁর জীবন ও অবদানের জন্য মহান ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমরা আশা করি অচিরেই ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সাধু থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী হয়ে ওঠবেন।

মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মে। পৃথিবীতে এমনি অনেক নরনারী রয়েছেন যারা নিজের জন্য কিছুই করেন না। সব কিছু করেন অপরের মঙ্গলের জন্য। এসব তারা করেন নীরবে, সকলের গোচরে অথবা অগোচরে। খ্রিস্টযিশুতে সমর্পিত এমনি একজন নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিত্ব সিস্টার মেরী তেরেজা এসএমআরএ। ঈশ্বর যাকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন ভগ্নী থেকে মাতা হয়ে উঠতে। মহীয়সী মাদার আগ্নেশ তাকে রত্ন বলে ভূষিত করেছেন। তার শিক্ষকতার জীবন, আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মধ্যদিয়ে তিনি সকলের হৃদয় মন জয় করেছেন। বিশেষ ভাবে বৃদ্ধা, অসুস্থ সিস্টারদের সেবা কাজের মধ্যদিয়ে কষ্টভোগি যিশুর ভারী ক্রুশ বহনের অভিজ্ঞতা করেছেন। তিনি ছিলেন শুদ্ধতার প্রতিমূর্তি। শত কষ্টের মাঝেও কারও কাছে কোন অভিযোগ করেননি। সুআদর্শের প্রতিচ্ছবি সিস্টার তেরেজা অনেকের মা হয়ে বেঁচে থাকবেন ভক্তদের অন্তরে। দয়াময় প্রভু ঈশ্বরের কাছে এই কামনা করি।

এ সংখ্যাটি প্রকাশে প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘের (এসএমআরএ) সার্বিক সহায়তার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই ॥ †

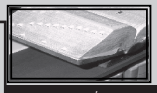

স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব: পৃথিবীতে তুমি যা বেধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে ; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে। মথি: ১৬:১৯।

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

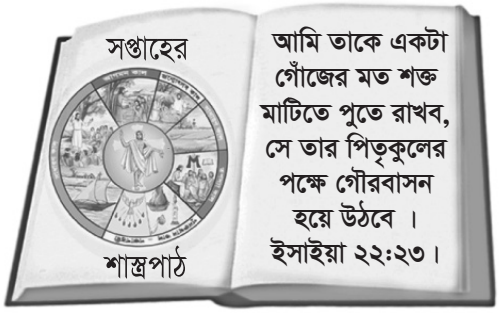

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৭ আগস্ট - ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

২৭ আগস্ট, রবিবার

ইসা ২২: ১৯-২৩, সাম ১৩৮: ১-৩, ৬, ৮, রোম ১১: ৩৩-৩৬, মথি ১৬: ১৩-২০

সাধ্বী মণিকা'র স্মরণ দিবস এ বছর পালিত হবে না।

২৮ আগস্ট, সোমবার

সাধু আগষ্টিন, বিশপ ও আচার্য, স্মরণ দিবস

১ থেসা ১: ২-৫, ৮-১০, সাম ১৪৯: ১-৬ক, ৯খ, মথি ২৩: ১৩-২২

২৯ আগস্ট, মঙ্গলবার

দীক্ষাগুরু যোহনের শিরচ্ছেদ, স্মরণ দিবস

সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:

জেরে ১: ১৭-১৯, সাম ৭১: ১-৬, ১৫, ১৭, মার্ক ৬: ১৭-২৯

৩০ আগস্ট, বুধবার

১ থেসা ২: ৯-১৩, সাম ১৩৯: ৭-১২কখ, মথি ২৩: ২৭-৩২

৩১ আগস্ট, বৃহস্পতিবার

১ থেসা ৩: ৭-১৩, সাম ৯০: ৩-৪, ১২-১৪, ১৭, মথি ২৪: ৪২-৫১

১ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার

১ থেসা ৪: ১-৮, সাম ৯৭: ১-২, ৫-৬, ১০-১২, মথি ২৫: ১-১৩

২ সেপ্টেম্বর, শনিবার

ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে

১ থেসা ৪: ৯-১১, সাম ৯৮: ১, ৭-৯, মথি ২৫: ১৪-৩০

ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী'র ৪৬তম মৃত্যুবার্ষিকী (+১৯৭৭)

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৭ আগস্ট, রবিবার

+ ১৯৯৩ সিস্টার মেরী গ্রেট্রুড এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯৫ ব্রাদার মার্সেল ডুশেন সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৮ ফাদার জেমস তোবিন সিএসসি
+ ২০২২ সিস্টার মেরী তেরেজা এসএমআরএ (ঢাকা)

২৮ আগস্ট, সোমবার

+ ১৯৮৩ সিস্টার মেরী ভিক্টুয়া আরএনডিএম
+ ২০০৫ সিস্টার এম. বেনেডিক্ট গমেজ আরএনডিএম (ঢাকা)

৩০ আগস্ট, বুধবার

+ ২০০৬ সিস্টার মেরী ডরোথী এসএমআরএ (ঢাকা)

৩১ আগস্ট, বৃহস্পতিবার

+ ২০০১ সিস্টার মেরী ফ্লোরেন্স এমসি (ঢাকা)
+ ২০০২ ব্রাদার রেমন্ড কুর্‌নোয়ায়ে সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার

+ ১৯২৩ ফাদার নাভা জভান্নি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭৫ সিস্টার মেরী মিরিয়াম পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ২০০১ সিস্টার এম. এ্যান অব যীজাস আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০২০ সিস্টার মার্টিনেট রিভার্স এমপিডিএ (ঢাকা)

২ সেপ্টেম্বর, শনিবার

+ ১৯৫৯ সিস্টার এম. আইরিন আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০০৩ সিস্টার সিলভিয়া মাচাডো এসসি (খুলনা)

খ্রীষ্টের একক যাজকত্ব

১৫৮০: প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোতে, ভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা শতশত বর্ষ ধরে বলবৎ রয়েছে: বিশপদের বেছে নেওয়া হয় অবিবাহিতদের মধ্য থেকে, তবে বিবাহিত পুরুষ ডিকন ও যাজকপদে অভিষিক্ত হতে পারেন। এই প্রথা অনেক বছর ধরে বিধিসম্মত বলে বিবেচিত হয়ে আসছে: এই যাজকেরা তাদের ভক্ত সমাজের মধ্যে ফলপ্রসূ সেবাকর্ম করে আসছে। অধিকন্তু প্রাচ্য মণ্ডলীতে যাজকীয় কৌমার্য গভীর সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয় এবং অনেক যাজকই ঐশরাজ্যের কারণে স্বাধীনভাবে যাজকীয় কৌমার্য গ্রহণ করেছেন। পাশ্চাত্য মণ্ডলীর মত,পাচ্য মণ্ডলীতেও যে-ব্যক্তি ইতিমধ্যে পুণ্য পদাভিষেক সংস্কার গ্রহণ করেছে।

ছ. পুণ্য পদাভিষেক-সংস্কারের ফলসমূহ

অক্ষয় ছাপ

১৫৮১: এই সংস্কার যে গ্রহণ করে পবিত্র আত্মার বিশেষ অনুগ্রহ তাকে খ্রীষ্টের সদৃশ করে তোলে, যাতে সে মণ্ডলীর জন্য খ্রীষ্টের হাতের যন্ত্ররূপে কাজ করতে পারে। পদাভিষেকের দ্বারা একজন মন্ডলীর মস্তক, খ্রীষ্টের প্রতিনিধিরুপে যাজক, প্রবক্তা ও রাজা হিসেবে তাঁর ত্রিবিধ দায়িত্ব পালন করেন।

১৫৮২: দীক্ষাস্নান ও দৃঢ়ীকরণ সংস্কারের বেলায় খ্রীষ্টের দায়িত্বে এই অংশগ্রহণ একবারই সবার জন্য দেওয়া হয়েছে। পুণ্য পদাভিষেক-সংস্কার, অপর দু'টো সংস্কারের মতই এক অক্ষয় আধ্যাত্মিক ছাপ এঁকে দেয়, এবং তা পুনর্বার গ্রহণ করা যায় না বা সাময়িকভাবে দেওয়া যায় না।

বিশেষ ঘোষণা

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর **ডিরেক্টরীর** নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেশী প্রকাশনীর সকল বিক্রয় কেন্দ্র থেকে তা সংগ্রহ করতে পারেন।

- পরিচালক, প্রতিবেশী প্রকাশনী, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

নির্দিষ্ট দিনের জন্য তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টারের হল ভাড়া কমানো হলো।

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, রবিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টারের হল ভাড়া (ভ্যাট সহ) টাকা= ১৩,০০০ (তের হাজার টাকা মাত্র)। এই ভাড়া আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কার্যকর হবে।

অনুমোদনক্রমে

তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটি

বিজ্ঞ/২৩০/২৩

অনন্য সাধারণ গুণাবলীর অধিকারী আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী

ফাদার আলবার্ট রোজারিও

আর্চবিশপ গাঙ্গুলী অনেক অনুপম গুণের অধিকারী ছিলেন যা তাঁকে সবার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র এবং মহান ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে এই গুণগুলি ছিল, পরবর্তী জীবনে সেগুলি আরো ফুল-পল্লবে বিকশিত হয়েছে। পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, বিশ্বাসী ভক্ত যে-ই তাঁর কাছে এসেছেন তাঁর বিনম্র মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর মধ্যে অহংকারের লেশ মাত্র ছিল না। তাঁর জনপ্রিয়তা শুধু মাত্র খ্রিস্টানদের মধ্যেই বিস্তৃত ছিল না, অন্যধর্মের ও মণ্ডলীর ভাইবোনদের কাছেও তিনি অনেক জনপ্রিয় ছিলেন। তারাও তাঁকে অনেক পছন্দ করতেন ও ভালোবাসতেন। এই মহান মেষপালকের প্রধান সম্পদ ছিল তাঁর নম্রতা ও চারিত্রিক শুদ্ধতা। **তাঁকে দেখলেই মনে হত কত নির্মল, শান্ত ও সৌম প্রকৃতির মানুষ তিনি। তাঁর কথা, ব্যবহার, আচার-আচরণ, নড়াচড়া সব কিছুর মধ্যেই ছিল শিশুসুলভ সরলতা ও স্নিগ্ধতা।**

যখন কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন তিনি কিছু বলার আগেই আর্চবিশপ আগে তাকে জিজ্ঞেস করতেন, কেমন আছ? এরপর অন্তরঙ্গভাবে তার সাথে আলাপ করতেন। ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচুঁ-নিচু সবার সাথেই তিনি সমান আচরণ করতেন। উচ্চ শিক্ষার কোন অহংকার তাঁর মধ্যে ছিল না। প্রয়াত ফাদার জিমারম্যান তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "একজন দক্ষ প্রশাসক বা নির্মাতা হিসাবে তাঁকে মানুষ যতটা না মনে রাখবেন তাঁর চেয়ে বেশি মনে রাখবেন তাঁর সাদাসিধা জীবন-যাপন এবং শিশুসুলভ ব্যক্তিত্বের কথা।

আর্চবিশপ গাঙ্গুলী নিজের সম্পর্কে বলতেন,"আমি হলাম মাত্র একটি মাটির পাত্র। ঈশ্বর এই পাত্রে অনেক মূল্যবান সম্পদ রেখেছেন। তাঁর এই অনুগ্রহ দানের জন্য আমি সব সময় কৃতজ্ঞ"। আর্চবিশপ গাঙ্গুলী ছিলেন একজন উত্তম মেষপালক এবং কোমলতা ও নম্রতার আদর্শ।

আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর বীরোচিত ধার্মিকতা ও পবিত্রতার আদর্শ এদেশের যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী ও বিশ্বাসী ভক্তদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে। তিনি হলেন স্বর্গীয় পিতার বেদিতে উৎসর্গীকৃত বলি বা নৈবেদ্য। তাঁর প্রার্থনাপূর্ণ পবিত্র জীবন খ্রিস্টভক্তদের হৃদয়ে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি সরাসরি গির্জায় চলে যেতেন। খ্রিস্টযাগের পূর্বে দীর্ঘ সময় তিনি আরাধ্য সংস্কারের সামনে ধ্যানে সময় কাটাতেন। সন্ধ্যাবেলায়ও তাঁকে গির্জায় দেখা যেত ধ্যানমগ্ন অবস্থায়।

ধন্যা কুমারী মারীয়ার প্রতিও তাঁর গভীর আস্থা ও ভক্তি ছিল। তিনি বলতেন,"যদি তুমি মাতা মেরীর কাছে প্রার্থনা কর, তবে তুমি বিফল হবে না"। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী যিশুখ্রিস্টের প্রতি আরো বেশি মনোযোগী হয়ে পরেন। বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অনুশীলনে তিনি প্রায়ই সারাদিন কাটাতেন। প্রতিদিন তিনি পবিত্র ঘন্টা করতেন এবং প্রতি শুক্রবার তিনি উপবাস থাকতেন এবং তিনি তাঁর সেই উপবাস নির্দিষ্ট কোন ধর্মপল্লী বা ব্যক্তির উদ্দেশে রাখতেন। আর্চবিশপ গাঙ্গুলী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন পার্থিব জীবনের সুখ-সম্পদ বড় কোন বিষয় না, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধন করে ঈশ্বরের আরো কাছে আসা হলো মানুষের বড় পাওয়া। তিনি পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস এবং আরাম আয়েস-আনন্দ পরিহার করে মানব সেবার জীবন বেছে নিয়েছেন।

আর্চবিশপ গাঙ্গুলী ছিলেন ভ্রাতৃপ্রেম ও শান্তির উদ্যোক্তা। তাঁর বহু লেখা ও পালকীয় পত্রে তিনি যে বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো– "আমার ভাই, আমার দায়িত্ব'। তাই তিনি ভাই-বোনদের প্রতি আরো দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন, যখন আমরা আমাদের ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে পারব তখনই আমরা নির্যাতিত ও গরীব ভাই-বোনদের সামনে আশার আলো হতে পারব। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে শান্তির পূর্ব শর্তই হলো ভালোবাসা ও ক্ষমা। তিনি বলেন, "পৃথিবীতে অন্যায্যতা ও অত্যাচারের মূল কারণ হলো ভালোবাসা ও ক্ষমার অভাব"। যিশুর মধ্যে যে ক্ষমা ও শান্তি প্রকাশিত হয়েছে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী তা-ই অনুসরণ করেছেন। যে কারণে কিছু মানুষের কাছ থেকে তিনি নির্যাতন ও কষ্ট পেয়েছেন। হাসি মুখে তিনি সবই সহ্য করতে পারতেন। কারো বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগ ছিল না। তাঁর এই বিষয়টা কেউ কেউ প্রশাসনিক দুর্বলতা হিসেবে দেখতেন। তিনি কখনো কারো সাথে উচ্চ স্বরে কথা বলতেন না বা রাগ করতেন না। সমাজে দুর্বল ও পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর ছিল অনেক দয়া। যখনই তিনি সুযোগ পেতেন তিনি তাদের কাছে আসতেন এবং তাদের আনন্দ-দুঃখ-বেদনার কথাগুলো শুনতেন।

একবার তিনি কমলাপুর রেল স্টেশনে একদল কুলির সাথে আলাপ করছিলেন। আর্চবিশপের মুখে সহানুভূতিপূর্ণ মিষ্টি কথাগুলি শুনে তারা খুব খুশি হলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে বেশ কিছু লোক জড় হয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন আর্চবিশপকে চিনতে পারলেন। কুলিরা যখন জানতে পারলেন যে উনি আর্চবিশপ তারা তখন তাড়াতাড়ি আর্চবিশপকে প্রণাম করলেন। কুলিদের মধ্যে একজন হঠাৎ বলে উঠলেন, "সত্যিই আজ আমরা একজন সাধু ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। জীবনে কত মানুষের জিনিস আমি বহন করেছি। কেউতো উনার মত এত সুন্দর করে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন নি"।

পরোপকারেচ্ছু আর্চবিশপ কখনো নিজের চাওয়া-পাওয়ার চেয়ে অন্যেরটাই বড় করে দেখেছেন। সারা জীবন তাঁর নিজের কষ্ট ও যন্ত্রণাগুলো একাই বহন করেছেন। যে কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর মেষগুলিকে ত্যাগ করে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে যান নি। শুনা যায় বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় তাঁর নামও ছিল। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি আর্চবিশপস্ হাউজেই ছিলেন। অথচ আর্চবিশপস্ হাউজের বাবুর্চী ও অন্যান্য কর্মীদের নিরাপত্তা চিন্তা করে তাদেরকে বেতন সহ বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের তিনি হাসি মুখে সেদিন বলেছিলেন, তোমাদের কাজগুলি আমি নিজেই করতে পারব।

আর্চবিশপ খুবই সাদাসিধা জীবনযাপন করতেন। তিনি সব সময় একজন সাধারণ যাত্রীর মতই ট্রেনে বা স্টিমারে তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষে যাতায়াত করতেন। তিনি বলতেন, "সকলে যেভাবে চলাচল করে আমিই সেভাবে চলতে আরামবোধ করি।" একবার তিনি তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে যাচ্ছিলেন। ট্রেনটিতে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। কোন উপায় না দেখে তিনি দুই বগির জয়েন্ট লিংকে উঠে তুমিলিয়া গিয়েছিলেন।

তিনি সব সময় অন্যের মতামতের মূল্য ও গুরুত্ব দিতেন। তাঁর নিজের অভিপ্রায় তিনি কখনো অন্যের উপর চাপিয়ে দিতেন না। যারা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে থাকতেন বিষয়টি তারা উপলব্ধি করতেন। কেউ কঠিনভাবে তাঁর সমালোচনা করলেও তিনি শান্ত থাকতেন, ধৈর্য ধরতেন।

বিনম্র ও কোমলপ্রাণ আর্চবিশপ গাঙ্গুলী কখনো কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলতেন না। এ ব্যাপারে তিনি সব সময় সতর্ক থাকতেন। তিনি চেষ্টা করতেন অন্যের মুখে হাসি ফুটাতে। তাঁর মধ্যে ভণ্ডামীর কোন স্থান ছিল না। তিনি সব সময় শুধু যিশুর উপর নির্ভর করে চলতেন। কোন ভুল করলে তা স্বীকার করতে তিনি বিন্দু মাত্র দ্বিধা করতেন না। একবার হাসনাবাদ গির্জায় চুরি হয়। চোর চেলিসে রক্ষিত আশীর্বাদিত কম্যুনিয়ন নিয়ে যায়। এ জন্যে হাসনাবাদ গির্জায় প্রার্থনায় যোগ দিয়ে তিনি এই প্রার্থনা করেছিলেন, হে প্রভু, পবিত্র সাক্রামেন্তের প্রতি এই অবমাননায় আমার যদি কোন ভুল থাকে, আমার অবহেলার কারণে যদি এই ঘটনা ঘটে থাকে, তবে আমি আমার মিশনবাসীর হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাই।

আজ যদিও আর্চবিশপ গাঙ্গুলী আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর স্মৃতিগুলি আমাদের সবার হৃদয়ে রয়েছে। তিনি আমাদের সামনে অনেক আদর্শ রেখে গেছেন। আমরা তখনই তাঁর প্রতি সম্মান দেখাতে পারব যখন আমরা তাঁর শিক্ষা অনুসারে চলতে পারব॥

ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী: কিছুক্ষণের দেখা ও সামান্য কথা

ড. আলো ডি'রোজারিও

শ্রদ্ধেয় সুনীল পেরেরা কর্তৃক সম্পাদিত ও সংকলিত ৭৯০ পৃষ্ঠার গবেষণালব্ধ গ্রন্থটির শিরোনাম- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী: বাংলাদেশ মণ্ডলীর গৌরব। ''ঈশ্বরের সেবক"- এর জন্ম, বাল্য-শিক্ষা-কর্মজীবন, বাণী, লেখা, উপদেশ, নির্দেশনাবলী, চিঠিপত্র, ইত্যাদিসসহ ভক্তজনের শ্রদ্ধাঞ্জলি সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি প্রায় পুরোটিই পড়েছি। পড়তে পড়তে অভিভূত হয়েছি জানা-অজানা বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষ করে তাঁর নম্রতা, পুণ্যতা, আধ্যাত্মিকতা, অমায়িকতা, ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা, অপরের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও দয়ার ধরন ও গভীরতা সম্পর্কে জানতে পেরে। ছাত্রাবস্থায় আর্থিক সংকটের মুখে আমি একবার এই মহৎপ্রাণ ব্যক্তির দ্বারস্থ হয়েছিলাম, সেই সময়ের সেই ভালোবাসাময় দয়ার দানের কথা কৃতজ্ঞতাভরে জানাতেই এই লেখা।

সেটা ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের কথা। আমি তখন নটর ডেম কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। কয়েক মাস হয় ঢাকা এসেছি। আর কয়েক সপ্তাহ হয় শ্রদ্ধেয় ফাদার পল গমেজের সহায়তায় সদরঘাট ব্যাপটিস্ট মিশন ছাত্রাবাসে 'বিশেষ বিবেচনায় ও বিশেষ স্থানে' কোনোমতে আমার থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় ফাদার পল গমেজ তখন লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ছিলেন। ঢাকায় এসে প্রথম কয়েক সপ্তাহ ছিলাম সিরিল রোজারিও-এর বাসাতে, ঋষিকেশ দাস রোডে। আমার দাদু (মা'র বাবা) জন ডি'রোজারিও তখন সিরিল রোজারিও-এর বাসাতে থাকতেন, সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে পড়াতেন ও তার বাসার ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার কিছুটা দেখভাল করতেন। তাদের বসার ঘরের এক পাশে পাতানো একটি ছোট খাটে দাদু ঘুমাতেন। আমি ঘুমিয়েছি সোফার ওপর। গ্রাম হতে আসা আমি বেশিরভাগ সময় সোফা বা বিছানার ওপর বসে থাকতাম ও রাতে ঘুমাবার সময় মাঝেমধ্যে মুখের লালায় সোফা ভিজিয়ে ফেললে খুব লজ্জা পেতাম। আমার অপরাধবোধ টের পেয়ে সেই বাসার কেউ আমাকে কিচ্ছু বলতো না। তারা সকলে ছিল অনেক ভালো।

ঢাকা আসার কয়েক দিনের মধ্যে একটি টিউশনি পেয়ে যাই যেখান হতে আমার মাসিক আয় ছিল আশি টাকা। প্রথম টিউশনিটা ছিল আমার মায়ের মেসতুতো ভাইয়ের বাসায়, দুই মামাতো ভাইকে পড়াতে। দ্বিতীয়টা মিষ্টির দোকানের মালিকের ছেলেকে পড়াতে, দাদু যোগাড় করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় টিউশনি থেকে আমার আয় ছিল মাসে একশত টাকা। তৃতীয় টিউশনিটা পেতে বেশ কয়েক মাস দেরী হয়েছিল, সেটাও আমার দাদুই ঠিক করে দিয়েছিলেন। সদরঘাট ছাত্রাবাসে যাবার পর মাসে সীট রেন্ট দিতাম ত্রিশ টাকা ও দিনে দুই বেলা খাবারের জন্যে সেসময় সেখানে মাসে দিতে হতো দেড়শত টাকা। সকালের নাস্তা নিজেদের কিনে খেতে হতো। যেদিন কলেজে প্র্যাকটিকাল ক্লাশ থাকতো সেদিন আবার খেতাম আরামবাগের রাস্তার পাশের ছোটখাটো হোটেলে। ভর্তা-ডাল-ভাত খেলেও একবার খেতে দুই-আড়াই টাকা খরচ হতো। কলেজে মাসিক ফি ছিল পঁয়ত্রিশ টাকা। বেশিরভাগ সময় কলেজে হেঁটে যেতাম। কখনো কখনো সদরঘাট হতে বাসে গুলিস্তান গিয়ে বাকীটা পথ হেঁটে যেতাম। প্রতিবারে বাসভাড়া ছিল পঁচিশ পয়সা। সেটাই ছিল তখনকার দিনে ঢাকা শহরে সর্বনিম্ন বাস ভাড়া।

তো তখনো আমার তৃতীয় টিউশনিটা যোগাড় হয় নি। শুধু একটা বই কিনতে পেরেছি- জীববিদ্যার যা কী না প্রফেসর ভুঁইয়া ও ফাদার ড. টিম-এর লেখা। ইংরেজীতে লেখা এই পুরনো বইটি একদম কম দামে সদরঘাটের পুরনো বইয়ের দোকান থেকে কিনেছিলাম। বইটির প্রথম ও শেষ দিকে কয়েকটি করে পৃষ্ঠা ছিল না। বই নেই, প্র্যাকটিক্যাল খাতা নেই, পরিধানযোগ্য একটার বেশি শার্ট নেই, পায়ে জুতো নেই, থাকা-খাওয়া-যাতায়াতসহ অন্যান্য খরচ পাবো কোথায়, নেই সেই নিশ্চয়তা। এমতাবস্থায় কী করা যায় সেই বিষয়ে পরামর্শ নিতে কলেজের ডিরেক্টর অব গাইডেন্স শ্রদ্ধেয় ফাদার স্টিফেন গমেজ সিএসসি-এর সাথে দেখা করে আমার অবস্থা সব খুলে বললাম। তিনি ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনলেন। প্রশ্ন করে করে আরো বেশ কিছু বিষয় জেনে নিয়ে খুবই বাস্তবসম্মত পরামর্শ রাখলেন। শ্রদ্ধেয় ফাদার স্টিফেন বললেন, ''তুমি বরং লক্ষ্মীবাজার এলাকার কোনো কলেজে গিয়ে ভর্তি হও। তাতে আরো একটি টিউশনি ধরে তোমার আয়ে তুমি শহরে কোনোমতে থাকতে পারবে, পড়তেও পারবে। কুইজ বা ক্লাশ পরীক্ষা পুরোদমে শুরু হয়ে গেলে নটর ডেম কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের পড়ার চাপে তুমি একটার বেশি টিউশনি করার সময় পাবে না। আর তাতে তো তোমার ঢাকাতে থাকা-খাওয়াসহ অন্যান্য খরচ হবে না।"

তাহলে কী করা যায়? এই প্রশ্ন বুকে নিয়ে আমি গেলাম কলেজে বড়বাবু খ্যাত রাফায়েল কস্তার কাছে। তিনি আমাকে দেখে জানতে চাইলেন, আমি তার কাছে কী চাই। আমি কী বলে শুরু করবো তা স্থির করতে পারলাম না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি কিছু না বলে দাঁড়িয়ে আছি দেখে তিনি তার আসন ছেড়ে উঠে এসে সস্নেহে পিঠে হাত রেখে জানতে চাইলেন- আমার নাম, বাড়ি, কোন্ স্কুল হতে পাশ করে ঢাকা পড়তে এসেছি, কোথায় এবং কার সাথে থাকি, কী আমার সমস্যা, আর্থিক সাহায্যের জন্য কোথাও দরখাস্ত করেছি কী না, ইত্যাদি সব কিছু। তার স্নেহের স্পর্শে সাহস বেড়ে যাওয়ায় আমি তাকে আমার সব তথ্য দিলাম, আর্থিক সমস্যার কথা খুলে বললাম। কলেজের কোনো একটি সভায় যোগ দেবার জন্যে বের হয়ে যাবার পূর্বে একটি কাগজ ধরিয়ে দিয়ে তিনি আমাকে বললেন,''এই দরখাস্তের অনুরূপ একটি দরখাস্ত মহামান্য আর্চবিশপ বরাবরে লিখো, আমি ফিরে এসে দেখবো।" আমি তা লিখে বসে রইলাম। তিনি ফিরে এসে দরখাস্তটি পড়ে দেখলেন, দরখাস্তের নীচে এক পাশে সুপারিশসহ সই করলেন, কলেজের সীল মারলেন ও আমাকে বললেন, "এই দরখাস্তটি নিয়ে আর্চবিশপ হাউজে যাও, মহামান্য আর্চবিশপ মহোদয়ের সাথে দেখা করে তাঁর হাতে এটা দিয়ে আসো। আর্চবিশপ হাউজের গেইটে থাকা লোকজন যেতে না দিলে বলবে যে নটর ডেম কলেজ হতে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি।"

আমার আর্চবিশপ হাউজে পৌঁছুতে খুব বেশি সময় সেদিন লাগে নি। তবে সময় লেগেছিল পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর দেখা পেতে। আর্চবিশপ হাউজের লোকজন কিছুতেই আমাকে সুযোগ করে দিতে চাচ্ছিলেন না যেন আর্চবিশপ মহোদয়ের সাথে দেখা করে হাতে হাতে আমি দরখাস্তটি দিতে পারি ও দু'একটি কথা তাঁকে বলতে পারি। তাদের এক কথা যেন তাদের হাতে দরখাস্তটি দিয়ে দেই আর তারা তা দিয়ে আসবেন দু'তলায়, আর্চবিশপ মহোদয়ের নিকট। দরখাস্ত নিয়ে আমি নিজে উপরে যাবো, এই ব্যাপারে আমি ছিলাম একদম নাছোড়বান্দা। আমাকে অনেক করে বুঝানো হলো কেনো

তারা আমাকে উপরে যেতে দিতে পারবেন না। আমি তাদের কথায় বুঝ না মেনে দাঁড়িয়ে রইলাম বারান্দায়, একদম সিঁড়ির সামনে। আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমার মনে যেন এমন একটা পণ- যতক্ষণ দেখা না পাই ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো।

একসময় হঠাৎ করেই সিঁড়ির সামনের প্রধান দরজা ভেতর থেকে খুলে গেল। প্রথমে একজন বিদেশী বের হলেন এবং তার পেছন পেছন বের হলেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মহোদয়! বিদেশী ভদ্রলোকটিকে বিদায় দিয়ে ফেরার মুখে আমার দিকে চোখ পড়াতে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী এগিয়ে আসলেন আমার দিকে। আমি নিশ্চল, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, মাথা নত করে কী বলে যে সেদিন প্রণাম করেছিলাম আজ আর তা মনে পড়ছে না। তিনি জানতে চাইলেন, ''কী নাম তোমার, কার কাছে এসেছো, কে পাঠিয়েছেন...।'' আমি ভয়ে ভয়ে তাঁর হাতে দরখাস্তটা দিলাম, যেটা ছিল নটর ডেম কলেজের খামের ভেতরে। তিনি খামটার ওপরে চোখ বুলিয়ে এবং তা না খুলেই বললেন, "তোমাকে কী বড় বাবু পাঠিয়েছেন? আমি মাথা উপর হতে নীচ দিকে নেড়ে হ্যাঁবোধক উত্তর দিলাম। তারপর তাঁকে অনুসরণ করে সিঁড়ির পাশে প্রথম ঘরটাতে ঢুকলাম। তিনি বসতে বললেন। আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। তিনি বসলেন। বসে দরখাস্তটি পড়লেন। অতঃপর আমাকে দু'একটি প্রশ্ন করলেন। সবশেষে আমাকে বললেন,''তুমি অনেক দেরীতে এসেছো। তোমার আগে আরো কয়েকজন এসেছিল, তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত আমরা কলেজে জানিয়ে দিয়েছি। দেখি তোমার জন্য কী করা যায়। বড় বাবু তোমাকে আমাদের সিদ্ধান্ত জানাবেন।" আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনছিলাম। কী দরদী, মৃদু ও কোমল তাঁর কণ্ঠস্বর! ধন্যবাদ জানিয়ে বের হবার সময় তিনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন। আমাকে সাথে করে খাবার ঘরের দরজার সামনে নিয়ে গিয়ে বললেন,''ডানিয়েল, ওকে কিছু খেতে দাও।"

পরের দিনে সোয়া আটটায় ঢুকছিলাম তখন ক্লাশবন্ধু পুরনো ঢাকার বাংলাবাজারের আইয়ুব আনসারী আমাকে বললো,''তোমার নামে নোটিশ আছে নোটিশ বোর্ডে, দেখেছো? কী করেছো তুমি যে তোমার নামে নোটিশ?" কীসের নোটিশ তা জানতে প্রশ্ন করার আগেই দেখি শ্রদ্ধেয় ফাদার পিশাতো ক্লাশে ঢুকছেন, হাতে তার প্রথম কুইজের প্রশ্ন। শ্রদ্ধেয় ফাদার পিশাতো আমাদের পদার্থবিদ্যা পড়াতেন। পদার্থবিদ্যার ক্লাশ-শেষে দৌড়ে গেলাম নীচতলায়। গিয়ে দেখি নোটিশ বোর্ডে একটি গোলাপী কাগজে ইংরেজীতে লেখা: ROLL # 925, PLEASE SEE ME. THANKS, R. COSTA. আমি দুরু দুরু বুকে বড় বাবুর অফিস কক্ষে ঢুকতেই তিনি বললেন, "তোমার জন্যে সুখবর আছে। মহামান্য আর্চবিশপ মহোদয় তোমার জন্যে ছয়শত টাকা পাঠিয়েছেন। তাঁর নির্দেশ মতে আমি একশত পাঁচ টাকা- গত মাসের বকেয়া বেতন, বর্তমান মাসের বেতন ও আসছে মাসের বেতন বাবদ রেখে বাকী টাকা এই নাও দিয়ে দিচ্ছি।" টাকাসহ খামটি আমাকে দিয়ে তিনি আরো বললেন, ''এই টাকা হতে তোমার জরুরী খরচ, যেমন বই ও খাতাপত্র কেনা, হোস্টেলে থাকা ও খাওয়ার জন্যে অগ্রীম দেওয়ার কাজগুলো সারো।" এত তাড়াতাড়ি অতগুলো টাকা আমি যে পাবো তা ছিল আমার চিন্তার বাইরে। আনন্দে আমার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়া শুরু হলো॥

বাড়ী ভাড়া হবে

১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

৫৫/ডি/১ পশ্চিম তেজতুরী বাজার ফার্মগেট, ঢাকা

পানি ও গ্যাস প্রচুর সুবিধা আছে

যোগাযোগের ঠিকানা

০১৭২৬৯১৬০১৮

বিজ্ঞ/২৫৬/২৩

আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

রেজিঃ নং : ৩৭৫/১৯৮২

তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ০৯ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা পরিষদের নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সন্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৩ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে অত্র সমিতির ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ব্যবস্থাপনা পরিষদের ১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন ভাইস-চেয়ারম্যান, ১ জন সেক্রেটারী, ১ জন ম্যানেজার, ১ জন ট্রেজারার ও ৪ জন সদস্য পদে সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা পরিষদের নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সদস্য/সদস্যাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সভার কর্মসূচী

১। নাম ডাক ২। আসন গ্রহণ ৩। জাতীয় পতাকা ও সমবায় পতাকা উত্তোলন ৪। প্রারম্ভিক প্রার্থনা ও সমিতির মৃত সদস্য/সদস্যাদের আত্মার স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন ৫। সভাপতির স্বাগত বক্তব্য ও সভার উদ্বোধন ৬। সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণের জন্য সেক্রেটারী নিয়োগ ৭। ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন ৮। সেক্রেটারী কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পরিষদের রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন ৯। ম্যানেজার কর্তৃক বার্ষিক আর্থিক হিসাব-নিকাশ রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন ১০। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট, ২০২৩-২০২৪ ও ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের বাজেট পেশ ও অনুমোদন ১১। পর্যবেক্ষণ পরিষদের রিপোর্ট পেশ ১২। ঋণদান পরিষদের রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন ১৩। বিবিধ / মুক্ত আলোচনা, ১৪। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ১৫। ব্যবস্থাপনা পরিষদের নির্বাচন ১৬। মধ্যাহ্ন ভোজ ২১। লটারী ও সমাপ্তি।

ধন্যবাদান্তে,

জন পিরিজ
চেয়ারম্যান
আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

আইরিন ডি.ক্রুজ
সেক্রেটারী
আঠারগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/২৫৮/২৩

সিস্টার মেরী তেরেজা একজন কষ্টভোগী সেবিকা

ফাদার কমল কোড়াইয়া

একজন ত্যাগী মহীয়সী সেবিকা তিনি। অন্যের জন্যে কিছু করতে না পারলেই তিনি কষ্ট পেতেন। নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগস্বীকার করে অন্যের উপকার-কল্যাণ-মঙ্গল করেও অনেক সময় অন্যের কাছ থেকে অনেক কষ্ট পেয়েছেন। তিনি সব কিছুই করেছেন যিশুকে ভালোবাসেন বলেই। কষ্টভোগী সেবক যিশুর প্রিয়তমা হয়েই। প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী (এসএমআরএ) ধর্মসংঘের একজন নিবেদিত প্রাণ **সিস্টার তেরেজা**। বাংলাদেশে দেশীয় ধর্মসংঘের সর্ববৃহৎ ধর্মসংঘ হলো এসএমআরএ ধর্মসংঘটি। শক্তভিত্তির উপর ধর্মসংঘটি দাঁড় করানোর পেছনে যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁদের পুরোগামীই হলেন সিস্টার তেরেজা। কোড়াইয়া বংশের একজন সদস্য হিসেবে ছোট বেলা থেকেই তাঁকে আমি চিনতাম। বড়দের কাছে তাঁর বিষয়ে অনেক কথা শুনেছি। তুমিলিয়া মিশনে তাঁকে অনেক সময় দেখেছি। দরিদ্র কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। মা ছিলেন একজন শিক্ষিকা। সন্তানদের ভরণপোষণ-লেখাপড়া ও পরিবারে কিছুটা হলেও আর্থিক সহায়তার কথা চিন্তা করে তাঁর মা সন্তানদের বাড়ীতে রেখেই সুদূর কুমিল্লা আওয়ার লেডী অব্ ফাতিমা স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। ছোট মেধাবী তেরেজা পড়াশুনায় খুব ভাল ছিলেন। দেখতেও ছিলেন সুন্দরী। তৎকালীন প্রথা অনুসারে তাঁকে বিয়ে দেয়ার আয়োজনও হয়েছিল। অনেক যুবকও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ছিল। বলতে গেলে সবার অমতে তিনি পালিয়ে তুমিলিয়া কনভেন্টে চলে যান। নব প্রতিষ্ঠিত এসএমআরএ সম্প্রদায়ে সিস্টার হবার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যিশুর প্রতি তাঁর আস্থা-বিশ্বাস-ত্যাগ দেখে কর্তৃপক্ষ তাঁকে নিরাশ করেননি। যাত্রা শুরু হয় তাঁর ব্রতীয় জীবনের। ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনায় তিনি হয়ে ওঠেন সিস্টার তেরেজা।

ফাদার উর্বান কোড়াইয়া'র সাথে তাঁর অনেক আলাপ হতো। সম্পর্কে ফাদার উর্বান তাঁর কাকা। খুব সুন্দর করে ফাদার কাকা ডাকতেন। শুনেছি তাঁদের আলাপ-আলোচনায় বারবারই চলে আসতো ধর্মীয় নানা প্রসঙ্গ। নানা উদাহরণ। তাঁরা অনেক স্মৃতিচারণ করতেন। ছোট বেলায় সান্ধ্য প্রার্থনা না করলে রাতের খাবার ভাগ্যে জুটতো না। খাবারের আগের পরের প্রার্থনা মুখস্থ না পারলে অবস্থা খারাপ। কাকডাকা ভোরে ঘুম থেকে উঠে হাঁড়ি-বাসন মেজে ও উঠান ঝাড়ু দিয়ে তারপর পবিত্র খ্রিস্টযাগে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। বাড়ী ফিরেই আবার ক্ষেতখোলায় কাজে সাহায্য করতে হতো। আরও কত কি কথা! তাঁদের আলোচনা যেন শেষ হতেই চাইতো না। তাঁরা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়েও কথা বলতেন।

সিস্টার তেরেজা কোড়াইয়া বংশের অনেক ইতিহাস জানতেন। অনেক কোড়াইয়া পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। সম্পর্কে কে কি হন তাও তিনি জানতেন। সম্বোধনও করতেন। কোড়াইয়া গোষ্ঠীর তথ্য ভাণ্ডার তাঁর

কাছে যেন গচ্ছিত ছিল। কোন ধর্মপল্লীতে কোথায় কোড়াইয়া বংশের লোক আছে, তাদের আদি নিবাস কোথায় ছিল তা তাঁর নখদর্পণে ছিল। অনেক সময় এগুলো নিয়ে তাঁর সাথে আলাপও করেছি। জেনেছি অনেক অজানা তথ্য। ইচ্ছা ছিল ফাদার উর্বান কোড়াইয়া ও সিস্টার তেরেজার ইতিহাস ভাণ্ডার থেকে তথ্য নিয়ে একটি বই লিখব। তা আর হল না। ফাদার উর্বান ক'দিনের অসুখেই চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলেন। সিস্টার তেরেজাও চলে গেলেন। আমাদের অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার জন্যেই অনেক অমূল্য তথ্য ভাণ্ডার আমরা হারালাম। বঞ্চিত হলো আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম।

সম্পর্কে আমি তাঁর ভাই হই। তিনি প্রতি বছর বড়দিনে ও ইস্টারে আমাকে শুভেচ্ছা কার্ড পাঠাতেন। খুব সুন্দর হাতের লেখা। অনেক সময় হাতে তৈরী কার্ড পেতাম। অল্প কথা কিন্তু খুবই অর্থপূর্ণ। শেষের দিকে কাঁপা কাঁপা হাতের লেখা। বুঝতেই পারতাম-এখন আর আগের মত হাত ঠিক রেখে লিখতে পারেন না। বড়দিনে বাড়ীতে গেলে তুমিলিয়া সিস্টারের সাথে দেখা করতে যেতাম। প্রণাম করার আগেই তিনি বলতেন, কেমন আছো ভাই? এখন আর আগের মত চলা ফেরা করতে পারি না। তোমরাও সাবধান থেকো।

সাবধান থাকার বিশেষ সতর্কবার্তার একটি বিশেষ কারণ আছে। আমাদের কোড়াইয়া বংশের ট্রেডমার্ক রোগ হল হাঁপানী। আমিও এ বংশীয় রোগের অংশীদার। হাঁপানী আমারও আছে। আর সিস্টার তেরেজা অনেক বছর ধরেই হাঁপানী রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন। শ্বাস নিতে কষ্ট হতো। রাতে ঘুমেরও সমস্যা হতো। ঠিক মত খেতে পারতেন না। নিয়মিত তাঁকে বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে শ্বাস গ্রহণ করতে হতো। ক্লান্ত হতেন কিন্তু কাজ থেকে বিরত থাকতেন না। তিনি নিয়মিত বৃদ্ধা সিস্টারদের সেবা করতেন। তাঁদের সাথে কথা বলতেন। খাইয়ে দিতেন। গোসল করিয়ে দিতেন। সকালে তাঁদের প্রস্তুত করে প্রার্থনা-খ্রিস্টযাগে নিয়ে যেতেন। এক সাথে প্রার্থনা করতেন। বৃদ্ধ-অসুস্থ সিস্টারদের আত্মীয়-পরিজন এলে তাদের সময় দিতেন। কথা বলতেন। তিনি যেন ভুলেই যেতেন তিনি নিজেও অসুস্থ, তাঁর বয়স হয়েছে।

এসএমআরএ সম্প্রদায়ে সুপিরিয়র জেনারেল হিসেবে দুই টার্ম অত্যন্ত দক্ষতা, সুনিপুণতা ও গভীর আধ্যাত্মিকতায় দায়িত্ব পালন করে তিনি ধর্মসংঘের নিয়ম অনুযায়ীই অবসরে যান। তিনি নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন সম্প্রদায়ের বৃদ্ধা সিস্টারদের সেবা করার। মাদার হাউজ তুমিলিয়ায় অবস্থিত ধর্মসংঘের বৃদ্ধাশ্রমে তিনি আমৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিই যেন অনেক কিছু। অন্যকে তিনি ভাল ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করতেন। ঢাকায় নিয়ে আসতেন। কিন্তু তিনি নিজে ঢাকায় এসে বড় ডাক্তার দেখানোর ব্যাপারে বরাবরই অনিচ্ছুক ছিলেন। আলাপচারিতায় তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, আমাদের সময়তো শেষ। ঈশ্বরের কাছে যাবার সময় হয়ে গেছে। তোমাদের এখনও মণ্ডলীতে অনেক কিছু দেবার আছে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিও। অসুখ হলে ভাল ডাক্তার দেখিও। অবহেলা করো না। অন্যের প্রতি তাঁর মমতা, দায়িত্ববোধ, সহানুভূতি আমৃত্যু তিনি প্রকাশ করেছেন। আমরা কি পারব তাঁর সুমহান আদর্শ ধরে রাখতে? আর একজন সিস্টার তেরেজা পেতে আমাদের আর কত বছর অপেক্ষা করতে হবে? কবে আমাদের অপেক্ষার প্রহর শেষ হবে? ৯

উজ্জ্বল এক নক্ষত্র সিস্টার মেরী তেরেজা

সিস্টার মেরী মিনতি এসএমআরএ

ভূমিকাঃ এসএমআরএ সংঘের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র সিস্টার মেরী তেরেজা। সংঘের তিনি একজন দক্ষ ও মেধাবী গঠনদাত্রী ও প্রশাসক । সিস্টার তেরেজার সাথে আমার পরিচয় হয় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। আমি সবে মাত্র এসএসসি পরীক্ষা সমাপ্ত করেছি। সিস্টারগণ জানতেন আমি সিস্টার হবো। সেজন্যই হয়তো সিস্টার জ্যোতি, এসএমআরএ একদিন আমাকে সেন্ট মেরীস্ কনভেন্ট, তুমিলিয়া নিয়ে এসেছিলেন সিস্টার তেরেজার সাথে দেখা করতে। তিনি তখন সংঘের সুপিরিয়র জেনারেল, থাকেন মেরী হাউজে তেজগাঁও। কোন কারণে সিস্টার তুমিলিয়া এসেছেন। আমাকে চ্যাপেলের বারান্দায় অপেক্ষা করতে বলে সিস্টার জ্যোতি দুতালায় গেলেন। অচেনা-অজানা পরিবেশ, অনেক সিস্টার আনাগোনা করছেন। আসা যাওয়ার পথে পরিচয় জানতে চাচ্ছেন, আমি লজ্জা পাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি সিস্টার জ্যোতির সাথে একজন সিস্টার আসছেন। গোলগাল চেহারা, হাসিমাখা মুখখানা খুবই সুন্দর লাগছে। কাছে এসে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন কেমন আছি। সিস্টার জ্যোতি আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং এও বললেন যে আমি সিস্টার হতে চাই। সিস্টারও আগ্রহ নিয়ে আমার কুশলাদি, পরিচয় জেনে খুশী হয়ে বলেছিলেন যে, আমার মাকে ভাল চিনেন, সিস্টারের বৌদি আমার রূপি মাসী এবং আমার বড় মামা গাব্রিয়েল (গাবু দাদা) সেন্ট মেরীস্ কনভেন্টের মালী কাজ করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমিও খুব খুশী হই। আমাকে আশীর্বাদ দিয়ে বলেছিলেন যে, মেরী হাউজে দেখা হবে। ঐদিনের মতো খুশী মনে বাড়ী ফিরে আসি এবং মায়ের কাছে গল্প বলি। মায়ের কাছে জানতে পারলাম সিস্টারদের বাড়ীর নাম পিয়ন বাড়ী এবং উনারা দু'বোন সিস্টার সন্ধ্যা ও মণি। তারপর ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে মেরী হাউজে আসি এস্পাইরেন্ট হিসেবে। সিস্টার তেরেজাকে তখন থেকে কাছে পেয়েছি। খুবই তৎপর, চটপটে স্বভাবের মানুষ তিনি। তাঁর দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ, কোনভাবে তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আমরা কে কোথায় কি করছি তা তিনি খেয়াল রাখতেন। আমার সঙ্গিরা অনেকে সিস্টারকে ভয় পেতেন কিন্তু আমি সিস্টারকে ভয় পেতাম না, কারণ তুমিলিয়াতে অল্প সময় কথা বলে আমার ভয় দূর হয়েছিল। আমার অভিজ্ঞতা থেকে সিস্টারের জীবনের কিছু দিক যা আমাকে স্পর্শ করেছে ও প্রতিনিয়ত প্রেরণা দিচ্ছে তা সহভাগিতা করছি:

প্রার্থনা- ধ্যানী সিস্টার তেরেজাঃ ব্রতীয় জীবনের শুরু থেকে অনেক বছর সিস্টারকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। ঈশ্বর বিশ্বাসী, প্রার্থনা-ধ্যানী সিস্টার তেরেজা। সংঘের সমবেত ভক্তির অনুশীলন ছাড়াও তিনি দীর্ঘ সময় ব্যক্তিগত প্রার্থনায় চ্যাপেলে সময় কাটাতেন। দিনের বিভিন্ন সময় বিশেষভাবে সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় সিস্টারকে দেখতাম চ্যাপেলে প্রার্থনা-ধ্যানে নিমগ্ন। আমার খুব ভাল লাগতো দুপুর ৩টার সময় সিস্টার যখন একা ক্রুশের পথ করতেন। সারা বছরই তিনি ক্রুশ ধ্যান করতেন। পরবর্তীতে আমরা যখন সাময়িক সন্ন্যাসব্রতী আমাদের তিনি একই প্রেরণা দিয়েছেন যেন ক্রুশকে ভালোবাসি।

ভ্রাতৃপ্রেম ঘোষণার নিরলস প্রবক্তাঃ সংঘকর্ত্রী হিসেবে সিস্টারের প্রধান প্রচেষ্টা ছিল পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন সুদৃঢ় রাখা। কলহ-বিবাদ, কথা বন্ধ রাখা, নেতিবাচক সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিতেন। আশ্রমে কেউ শান্তি ভঙ্গের কারণ হলে তিনি যথেষ্ট কঠোর হতেন। তিনি কারো নেতিবাচক সমালোচনা করতেন না। ভগ্নিদের মধ্যে সম্পর্কের সমস্যা হলে তিনি একপক্ষের কথা না শুনে সংশ্লিষ্ট সবার কথা শুনে সমাধান দিতেন। সিস্টারের মুখে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা কোনদিনই শুনি নাই। অন্যদের মুখে শুনতেও পছন্দ করতেন না। ভাবতেও অবাক লাগে সংঘের প্রতি তার ভালোবাসা কত গভীর! মৃত্যুর কিছুদিন আগে মাতৃগৃহের পরিচালিকা সিস্টার অনিতাকে অনুরোধ করেছেন যেন সংঘের মন্ত্রণা পরিষদকে ডাকা হয়, তিনি মৃত্যুর পূর্বে সংঘের জন্য কিছু কথা বলে যেতে চান। আমরা গেলে পর তিনি প্রথমে বলেছেন আমরা যেন পরস্পরকে ভালোবাসি, কথা বন্ধ করে না রাখি। সংঘের সুনাম যেন রক্ষা করি। নব্যারা যেন নব্যালয়ে সব কিছু শিখতে আগ্রহী থাকে।

বয়োজ্যেষ্ঠাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলঃ সিস্টার সংঘকর্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠা সিস্টারদের দেখাশুনার দায়িত্বটি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ভালোবাসার সাথে করেছেন। বয়স্কদের সেবাকাজটি তত সহজ নয়। অনেকের সেই ধৈর্য থাকে না। সিস্টার তাদেরকে সার্বিকভাবে সুখী রাখতে সর্বস্ব দিয়ে সেবা করেছেন। কার জন্য কোন খাবার, ঔষধ-পথ্য দরকার তিনি এ ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। নিজ হাতে অসুস্থদের স্নান করানো, খেতে না চাইলে আদর দিয়ে খাওয়ানো ছিলো সিস্টারের বিশেষ প্রচেষ্টা। কোন কারণে শান্তিভবনের সিস্টারদের কোন খাবার দিতে ভুলে গেলে তিনি দুঃখ পেতেন। বয়স্কদের আনন্দ দেবার জন্য বৎসরে অন্তত একবার কাছের আশ্রমে ঘুরতে নিয়ে যেতেন। এত ভালোবাসা ও যত্ন পেয়ে শান্তিভবনের সিস্টারগণ সিস্টারকে **তেরেজা মা** বলে ডাকতেন।

শারীরিক যত্নের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক যত্ন ছিল অতুলনীয়। বয়োজ্যেষ্ঠাদের নিয়ে তিনি সব ধরণের প্রার্থনা নিয়মিত করতেন। ভালো মৃত্যুর জন্য সিস্টারদের প্রস্তুতি দিতেন। মাঝে মাঝে ফাদার ডেকে পাপস্বীকার ও খ্রিস্টযাগের ব্যবস্থা করতেন। সিস্টারদের অবস্থা যখন খারাপ হতো প্রথমে তিনি ফাদার ডেকে রোগী লেপন সংস্কার দিতেন এবং পালাক্রমে আশ্রমের সিস্টারদের প্রার্থনা করতে বলতেন। এভাবে দিন-রাত পাশে থেকে সিস্টারদের অন্তিম যাত্রাপথ সুখময় করেছেন । অনেককে তাই বলতে শুনেছি "সিস্টার তেরেজার হাতে মৃত্যু হলে ভালো হতো!" সিস্টার সব সময় আমাদের অনুপ্রাণিত করতেন আমরা যেন বয়োজ্যেষ্ঠাদের অবহেলা না করি, তাদের ভালোবাসি ও সেবা করতে এগিয়ে আসি। তাদের যেন সঙ্গ দেই ও কথা শুনি, কারণ তারা সংঘের স্তম্ভ।

সংঘের একজন সংস্কারক: সিস্টারের মুখ থেকে শুনেছি যে, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পরবর্তীতে মণ্ডলী ও ধর্মসংঘগুলিতে নানা ধরণের পরিবর্তন এসেছিল এবং আমাদের সংঘেও এর কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। যদিও সিস্টার তেরেজা তখন সংঘপ্রধান ছিলেন না তবুও তৎকালীন সংঘপ্রধান সিস্টার মেরীলিনের সঙ্গে তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ সহযোগী। তিনি সংঘের সবাইকে এক করে রাখার জন্য বয়সের ক্রম অনুযায়ী সেমিনারের ব্যবস্থা চালু করেছেন। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষা, এর নতুনত্ব গ্রহণ করার জন্য সেমিনারের মধ্যদিয়ে সিস্টারদের প্রস্তুতি দিয়েছেন। নিজেদের মধ্যে একতা বৃদ্ধির জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। নব্যা ও সাময়িক সন্ন্যাসব্রতী সিস্টারদের গঠন-প্রশিক্ষণ জোরদার করেছেন। সংঘের অর্থ-সম্পদ হিসাব নিকাশ রাখার পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে করার পদক্ষেপ নিয়েছেন। সংঘের বিভিন্ন ঘটনা, সিস্টারদের জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। মৃত সিস্টারদের জীবনী, শিক্ষাগত যোগ্যতা, তারা কোথায় কি সেবাকাজ করছেন ও তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী লিখিত আকারে তিনি সংঘের দপ্তরখানায় সংরক্ষণ করেছেন - যা আজও চলমান আছে। মোটকথা তিনি সিস্টারদের ব্রতীয় জীবন-যাপন থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কার্যক্রমের অনেক কিছু গুছিয়ে এনেছিলেন বলে পরবর্তীতে অনেক কিছু আমাদের পক্ষে সহজ হয়েছে। সুতরাং সিস্টার তেরেজাকে সংঘের একজন সংস্কারক বললে আশা করি ভুল হবে না।

তিনি বাংলাদেশ সন্ন্যাসব্রতী সম্মিলনীর (বিসিআর) প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যত্নশীল: সিস্টার তেরেজার আত্মীয় স্বজনের জন্যও বিশেষ দরদ ছিল। সব সময় তাদের ভাল-মন্দের খোঁজ-খবর রাখতেন এবং তাদের যে কোন সমস্যায় বা প্রয়োজনে পরামর্শ ও প্রার্থনা দিয়ে সহায়তা দিতেন। আমার মনে পড়ে যখন আমি মেরী হাউজে থেকে কলেজে পড়ি তখন ফাদার জের্ভাসও (বর্তমান বিশপ) মামার বাড়ীর দূর সম্পর্কের আত্মীয় আসলে সিস্টার সারা, আন্তনী ও আমাকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দেন, এর আগে তাদের আমি চিনতাম না। সিস্টারের কয়েকজন আত্মীয় ফাদার আছেন, ফাদার কমল কোড়াইয়া, ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, ফাদার মিন্টু পালমা তাদের তিনি নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখতেন ও প্রার্থনা করতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে সুশৃংখল: সিস্টারের কাজ ছিল সুশৃংখল ও পরিপাটি। তিনি হাতের কাজে বিশেষভাবে সেলাই কাজে পারদর্শী ছিলেন। মাঝে মাঝে আমাদের হাতের সেলাই দেখতেন এবং সুন্দর না হলে খুলে আবার করতে বলতেন। সিস্টারের ঘরে কাজ করতে গেলে খুবই সচেতন হয়ে করতে হতো। দরজা-জানালা ঠিক মতো খোলা ও বন্ধ করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নিঃশব্দে কাজ করতে শিখাতেন। তিনি বলতেন আমরা বঙ্গালী; চলা-ফেরায়, কথা বলায়, আচরণে, পোষাকে যেন মার্জিত হই ও বাঙালী সংস্কৃতি কৃষ্টি ধরে রাখি। আমরা যেন অতিথিপরায়ণ হই।

কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত: সিস্টার তেরেজাকে সংঘে এসে সুপিরিয়র জেনারেল হিসেবে পেয়েছি। সব সময় তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। আমি যখন মেরী হাউজে পরিচালিকার দায়িত্ব পেয়েছি সিস্টারস্ তেরেজা, মেরীলিন তাদের সামনে কথা বলতে সংকোচ অনুভব করতাম। কিন্তু সিস্টারদের বন্ধুসুলভ আচরণ, সহযোগিতা, পরামর্শে আমার সব বাঁধা দূর হয়ে যায়। যে সব ব্যাপারে অনুমতি নেয়া প্রয়োজন তা তিনি নিতেন। সংঘকর্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে সিস্টার বলতেন, আমি আপনাদের জন্য সব সময় প্রার্থনা করি। কারণ বর্তমানকালে পরিচালনার কাজ কঠিন। আপনাদের কষ্ট আমি বুঝতে পারি। সিস্টারের এসব আশ্বাসভরা কথায় অনেক শক্তি-সাহস পেতাম।

কষ্ট সহিষ্ণু : সিস্টার তেরেজা সব সময় মাথা ব্যাথা ও শেষের দিকে হাঁপানী রোগে কষ্ট পেতেন। কিন্তু এ অসুস্থতা নিয়ে সংঘের নব্যা পরিচালিকা, সংঘকর্ত্রীর মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি করেছেন। অসুস্থতার জন্য ডাক্তারের পরামর্শে কিছু খাবার তিনি কোন দিনই খেতেন না। দুপুরে বিশ্রাম না নিয়ে তিনি উল দিয়ে চাদর, মাফলার বানিয়ে মফঃস্বলে গরীবদের জন্য পাঠাতেন।

২০২২ খ্রিস্টবর্ষের জুন মাসে সিস্টার পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে অচল হয়ে পড়েন। প্রচণ্ড ব্যাথায় তার মুখে ছিল যিশু নাম: Jesus I love you. Jesus I praise you. Jesus I thank you.ব্যাথা যত তীব্র হতো, তত জোড়ে তিনি যিশুকে ডাকতেন, যিশুর প্রশংসা করতেন। জীবনের শেষ সময়ে বিছানায় থেকে যিশুর ভারী ক্রুশটি বহনের অভিজ্ঞতা করেছেন- এ হলো নিবেদিত প্রাণ সন্ন্যাসব্রতীর সৌন্দর্য। মুখে যা শিক্ষা দিয়েছেন নিজ জীবনে তা আচরণ করে আমাদের সবার জন্য তিনি অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে আছেন।

২৭ আগস্ট, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ, এ পৃথিবী থেকে সিস্টারের চির বিদায়ের দিন! আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ঐ দিন সিস্টারের পাশে থাকার। সকাল হতে সিস্টারের অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখে আমরা প্রার্থনা করছিলাম এবং ডাক্তার-নার্স সিস্টারগণ বিভিন্ন চিকিৎসা দিচ্ছিলেন। অতঃপর দুপুর ২:৪৫মিনিটে সিস্টারগণ যখন ঐশ করুণার মালা প্রার্থনা করছিলেন এবং মৃত্যুর মুহূর্তে যে প্রার্থনা হয় আমি তা কানের কাছে বলছিলাম, তখনই অনেক ভগ্নির উপস্থিতিতে, প্রার্থনাপূর্ণ পরিবেশে পৃথিবীর সব মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে নীরবে পরম পিতার স্নেহবক্ষে আশ্রয় নিলেন।

সিস্টারের সুন্দর জীবন এবং প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘে সিস্টারের অতুলনীয় সেবার জন্য স্বর্গীয় পিতার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি। জীবিতকালে তিনি সংঘকে তথা আমাদেরকে অনেক ভালোবেসেছেন।পরপারে তিনি আমাদের ভুলে থাকতে পারবেন না-এ আমি বিশ্বাস করি। আমরাও সিস্টারকে কোনদিন ভুলে যাব না। সিস্টারের জীবনাদর্শ আমরা অনুকরণ করবো। আজীবন তিনি আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। প্রেমময় পিতা সিস্টারের সমস্ত পুণ্য কাজের পুরস্কার তাকে দান করুন॥

সিস্টার মেরী তেরেজা প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘের রত্ন বিশেষ

সিস্টার মেরী প্রফুল্ল

সিস্টার মেরী তেরেজা এসএমআরএ আমার দিদি। পিঠাপিঠি দুই বোন। আমার দাদা যোসেফ সবার বড়, বোন জুলিয়ানা সবার ছোট। আমার দিদি আমাদের পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান। ১৯৩৩ খ্রিস্টবর্ষের ৩১ আগস্ট পিতা গাব্রিয়েল কোড়াইয়া ও মাতা মিটিল্ডা কোড়াইয়ার ভালোবাসার ফসল রূপে তিনি এ পৃথিবীর আলো দেখতে পান। তাঁর বাপ্তিস্মের নাম ছিল সন্ধ্যা মারিসেলিন কোড়াইয়া। সময় হলে তিনি স্কুলে ভর্তি হন এবং লেখাপড়া শুরু করেন। তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ফলে অংকে ১০০ থেকে ১০০ তার পেতেই হবে। প্রত্যেক ক্লাশে প্রথম হওয়ার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারতো না। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রতিভা তৎকালীন প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার আগষ্টিন মারী, সিএসসির নজরে পড়ে। তাই তিনি বিনা খরচে বোর্ডিং এ রেখে পড়াশোনা করার সুযোগ করে দেন। এভাবে সপ্তম শ্রেণী থেকে শুরু করে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যান। পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য সিস্টার তাঁর জন্য বিশেষ স্কলারশীপেরও ব্যবস্থা করেন। তৎকালীন সময়ে সেলাই ডিপ্লোমা দিয়ে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৫১ খ্রিস্টবর্ষে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। সে বৎসরই তিনি ও সিস্টার ইমেল্ডা আগস্ট ৪ তারিখে সংঘে প্রবেশ করেন। তবে তার সংঘে প্রবেশ ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। বাইরে থেকে তাঁর জীবনের সমস্যা দেখা দিল। এ থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনি সিস্টারদের শরণাপন্ন হন এবং সংঘে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তখন সিস্টার যোয়ান অব আর্ক তৎকালীন পাল পুরোহিত ফাদার গ্রেগরী ষ্ট্যাগমায়ারের সহযোগিতায় তাকে সংঘে যোগদানের ব্যবস্থা করেন। তাঁর জন্য এ ছিল এক কঠিন ও সাহসী সিদ্ধান্ত কারণ তখন আমার মা কুমিল্লা আওয়ার লেডি অব ফাতিমা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা এত সহজ ছিল না। এমতাবস্থায় মাকে জানানো বা অনুমতি নেওয়ার অবকাশ ছিল না। তাঁকে সংঘে পেয়ে মাদার আগ্নেস এক বাক্যে বলে উঠলেন "সংঘে আমরা এক রত্ন পেয়েছি।" মাদারের এ অভিব্যক্তি অত্যন্ত সত্য। বহু গুণে গুণান্বিতা ছিলেন তিনি। মায়ের কাছ থেকে শিখেছিলেন সেলাই। যেমন- উলের কাজ ক্রুশি ও কাটিং। অবসর সময়ে তিনি এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। উল দিয়ে শাল, টুপি ইত্যাদি তৈরী করে তিনি প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত সিস্টারদের দিতেন গরীবদের জন্য।

ফিলিপাইন থেকে ফিরে এসে প্রাপ্ত জ্ঞান তিনি সংঘের ভগ্নীদের অধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য উদারভাবে বিলিয়ে দেন। তাই ভগিনীদের ব্রতীয় জীবনে নবীকরণের জন্য চলমান গঠন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এতদুদ্দেশে সমবয়সীদের জন্য দল গঠন করে সেমিনারের ব্যবস্থা করলেন। বিভিন্ন দলের সেমিনার তিনি একাই পরিচালনা করতেন। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি বিভিন্ন অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন যা সহজেই বোধগম্য হতো।

অবসর গ্রহণের পর তিনি মাতৃগৃহে অবস্থান করে শান্তিভবনের সিস্টারদের সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আন্তরিক ভালোবাসা নিয়ে অসুস্থ ভগিনীদের সেবা দিতেন। তাদের শরীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যত্ন নিতেন। প্রতিদিন তাদের কমূনিয়ন দিতেন, তাদের সঙ্গে মালা প্রার্থনা করতেন। তাদের জন্য মাঝে মাঝে খ্রিস্টযাগের ব্যবস্থা করতেন। তপস্যাকালে প্রতি শুক্রবার তাদের নিয়ে ক্রুশের পথ করতেন। এছাড়াও তিনি সিস্টারদের রোজারিমালা ছিড়ে গেলে ঠিক করে দিতেন। তিনি প্রার্থনাশীল আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। অধিক সময় চ্যাপেলে থেকে খ্রিস্টের সান্নিধ্যে সময় কাটাতেন। প্রতিদিন প্রাতঃরাশ সেরে ১০টা পর্যন্ত চ্যাপেলে থাকতেন। দুপুরে খাবার পর আবারও চ্যাপেলে যেতেন, ব্যক্তিগত প্রার্থনা ও মালা শেষ করে বিশ্রাম করতেন। এই ছিল নিয়মিত দৈনন্দিন রুটিন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। প্রার্থনা, খাবার ও বিশ্রাম বাদে বাকী সময় তিনি লেখালেখি, সেলাই ও বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকতেন। অসুস্থতা ছাড়া তিনি খ্রিস্টযাগ বাদ দিতেন না। ঝড় বৃষ্টি ও তীব্র শীতের মাঝেও তিনি খ্রিস্টযাগে যোগদান করতেন। দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তিনি শয্যাশায়ী হন। এ অবস্থায় এক সপ্তাহ মাতৃগৃহে থাকার পর পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য তাকে মেরী হাউজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও চিকিৎসা দেওয়া হয়। সেখানে ২/৩ সপ্তাহ থাকার পর তাঁকে মাতৃগৃহে ফিরিয়ে আনা হয়। মেরী হাউজে যখন ছিলেন, তখন দিনের বেশির ভাগ সময়ই আমি তাঁর পাশে থাকতাম। তখন তাঁর তীব্র যন্ত্রণা ছিল, যন্ত্রণায় কাতরাতেন। যখন যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠতো তখন সিস্টার রোজারিয়াকে ডাকতে আমাকে নির্দেশ দিতেন। এত কষ্টের সময়ও যিশুর প্রতি তাঁর ভালোবাসা অটুট ছিল। এ সময় তাঁর প্রার্থনা ছিল "Jesus I Praise you, Jesus I love you" অনেকক্ষণ ধরে তিনি এই প্রার্থনা করতেন।

তাকে মাতৃগৃহে আনার পর তিনি কিছুটা স্বাছন্দ বোধ করতেন। যদিও ঔষধের জন্য যন্ত্রণা কিছুটা কম ছিল। মাতৃগৃহে আনার পর আমি মেরী হাউজের মত অধিক সময় তাঁর পাশে থাকতাম না। তবে মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নিতাম এবং প্রায়ই তাঁর কাছে যেতাম। যখন তাঁর খারাপ লাগতো বেশি যন্ত্রণা হতো তখন তাঁর কাছে বসতাম। মাঝে মাঝে ঐশ করুণার মালা বা জপমালা করতাম। বিভিন্ন প্রার্থনা ও গান করতাম অতিরিক্ত কষ্টের সময় প্রার্থনা করতেন। "Heart of Jesus, I love you" এত কষ্টের সময়ও তাঁর কোন অভিযোগ ছিল না, মুখে শুধু ভালোবাসার কথা।

ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা ছিল তাঁর আদর্শ। তাই সিস্টার হওয়ার পর তিনি নতুন নাম নিলেন সিস্টার মেরী তেরেজা। সাধ্বী তেরেজার আদর্শে তিনি জীবন যাপন করতেন। তাই তার মুখে ছিল শুধু ভালোবাসার কথা। আর কলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজার জীবনে অনুপ্রাণিত হয়ে সংঘের বাইরে দরিদ্র মহিলাদের আয়ের ব্যবস্থা করলেন। তেজগাঁও জাগরণীর পরিচালিকা সিস্টার লিলিয়ানের সঙ্গে আলাপ করে কিভাবে তাদের আর্থিক উন্নয়ন করা যায় সে ব্যবস্থা করলেন। দরিদ্র মহিলাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং তাদের টাকা পয়সার হিসাব নিকাশ নিতেন। এতে দরিদ্ররা খুবই উপকৃত হত। সংঘের ভিতরেও শান্তি ভবনের অসুস্থ ভগিনীদের প্রতি তার ভালোবাসা সেবাযত্ন ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি ভ্রাতৃপ্রেমের এক উজ্জ্বল আদর্শ রেখে গেছেন।

শান্তি ভবনে যে মেয়েরা কাজ করত তাঁদের মধ্যে অমিল বা রেষারেষি হলে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে তাদের মধ্যে মিল করিয়ে দিতেন। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। শান্তি ভবনের সিস্টারদের আধ্যাত্মিক ও শারীরিক যত্ন নিতেন। কার কি প্রয়োজন তা খোঁজ খবর নিয়ে তা মেটাতেন। শোবার, বসার ক্ষেত্রে কার কি অসুবিধা তা জেনে নিয়ে তা দূর করার চেষ্টা করতেন। বড়দিনের আগে কেক কেটে প্রাক-বড়দিন করতেন। তিনি তাদের খুব ভালোবাসতেন। তারাও তাকে ভালোবাসত। সিস্টার মারী ডি লুর্ডস তাকে **"তেরেজা মা"** বলে ডাকতেন। সিস্টার ফিলোমিনার ভাইস্তা তাঁকে দেখে সব সময় বলতো আপনারা যে সেবা দেন আমার পিসি কিভাবে মরবে।

সিস্টার তেরেজা সংঘের একজন আধ্যাত্মিক পরিচালিকা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে তিনি তাদের কথা শুনতেন ও এগিয়ে চলার সাহস যোগাতেন। আশ্রম পরিচালিকা থাকাকালীন সময়ে নবীনা সিস্টারদের নিয়ে অনেক কাজ একসাথে করেছেন এবং তাদেরকে "সবুজ দল" নাম দিয়ে প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করেছেন।

তিনি সহ সংঘ স্থাপনকত্রী মায়ের ব্যবহৃত সব জিনিস দিয়ে আলমারী (শো কেসে) রেখেছেন। সংঘের পরিচালিকার সঙ্গে পরামর্শ করে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সত্যিই তিনি একজন মহান ব্যক্তিত্ব যার কথা সংঘ সব সময় মনে রাখবে॥

বিশ্ব স্রষ্টার এক অপূর্ব সৃষ্টি

সিস্টার মেরী কনসোলাটা এসএমআরএ

সুন্দর পৃথিবীর তুমি সুন্দর ভগবান।
সৃষ্টি তোমার প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
গাহে তব মহিমা গান,
তুমি সুন্দর ভগবান।।

বিশ্ব স্রষ্টা তাঁর মনের মাধুরী মিশিয়ে একটি সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এ বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর সব সৃষ্টিই উত্তম। এ শতকোটি সৃষ্টির মধ্যে আমি এক ছোট শিশুর বিষয় লিখছি। শিশুর নাম সন্ধ্যা কোড়াইয়া। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে এক ছোট্ট গ্রামে পিতামাতার কোল আলোকিত করে সে জন্ম গ্রহণ করে। পিতামাতা দু'জনেরই পেশা ছিল শিক্ষকতা। প্রাণ চঞ্চল এ শিশুকে সবাই ভালোবাসে। পিতামাতার আদর যত্নে সন্ধ্যা বেড়ে উঠতে থাকে। বিধির কি বিধান জানি না তার পিতা একদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং স্বর্গীয় পিতার ডাকে স্বর্গে চলে যান। এতে তার মা দিশেহারা হয়ে পড়েন কিভাবে তার এ চার সন্তানকে মানুষ করবেন। অতিসত্ত্বর বিদেশী হলিক্রস সিস্টারদের সহায়তায় তিনি কুমিল্লা আওয়ার লেডী অফ ফাতিমা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সুযোগ পান। তাদের একান্নবর্তী পরিবার থাকায় সন্ধ্যা ও তার ভাইবোনেরা, জেঠীমা ও কাকীমাদের সেবাযত্নে বেড়ে উঠতে থাকে। প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত এ শিশু সেন্ট মেরীস হাইস্কুলে পড়াশুনা করে, শ্রেণীতে সেরা শিক্ষার্থী বরাবরই শ্রেণীতে প্রথম স্থানটি দখল করেন।

এসএসসি পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশন পেয়ে সে তার মায়ের কাছে প্রকাশ করেন তার মনের কথা কিন্তু মা ও গুরুজনদের অমত থাকায় তিনি মিশনের ফাদারের সহায়তায় মায়ের অনুমতি না নিয়েই বাড়ীর সবার অজান্তে এসএমআরএ সংঘে চলে আসে। নব্যালয়ে সুন্দর গঠন পেয়ে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ প্রথম ব্রত ও ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ আজীবন ব্রত গ্রহণ করে। প্রথম ব্রত গ্রহণের সময় তার নাম হয় সিস্টার মেরী তেরেজা। ঈশ্বর সিস্টার তেরেজার প্রতিটা জ্ঞান বুদ্ধি দেখে তাকে সংঘের সম্পদ রূপে তৈরী করেন। হলি ক্রস কলেজে তিনি আইএ ও বিএ পাশ করেন। এরপর তিনি যে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন সেই বিদ্যালয়েই শিক্ষকতা করার সুযোগ পান। আমরা অনেক মেয়ে তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। সেন্ট মেরীস বালিকা বিদ্যালয়ে সকল শিক্ষিকাগণই ছিলেন সন্ন্যাসব্রতী, দক্ষ, পারদর্শী তাই তারা আমাদের সব বিষয়ে পারদর্শীতা অর্জনের জন্য বিষয় ভিত্তিক শিক্ষা ছাড়াও শিক্ষা দিতেন।

সিস্টার তেরেজার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ ও প্রখর শ্রবণ শক্তি ছিল। তার মধ্যে সংগঠন ও পরিচালনার দক্ষতা দেখে তাকে সুদূর ম্যানিলাতে ও হলিল্যান্ডে ঐশশিক্ষা লাভের সুযোগ দেন। পরে তিনি প্রাগনব্যা ও নব্যাদের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুনিপুণ ভাবে তার হস্তে অর্পিত দায়িত্ব নব্যাদের শিক্ষা দান তা পালন করেছেন। আমরা অনেকে তার কাছে শিক্ষা লাভ করে সন্ন্যাসব্রতী হয়ে মণ্ডলীতে কাজ করছি। ফাদার ন্যাফ সিস্টারের সাথে সহযোগিতা করে আমাদের বাইবেলের জ্ঞান দান করেন। ফাদার ন্যাফ ও সিস্টার তেরেজা নব্যালয়ে যিশুর প্রতি তাদের ভালোবাসার আদর্শ ও শিক্ষা আমাদের দান করেছেন। তারা বলতেন যিশুর ভালোবাসার জন্য আমরা সংঘে যত কাজ করতে পারি তা করবো, কখনও সেবা কাজ থেকে পিছুপা হবো না।

সিস্টার তেরেজা সংঘের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি পরপর দু'বার সংঘকর্ত্রী হিসেবে মোট বার বছর গুরুত্বের সাথে এ দায়িত্ব পালন করেছেন এর পরও মন্ত্রিণী হিসেবে সংঘের পরিচালনা কাজ করেছেন।

সিস্টার স্ব-ইচ্ছায় সংঘের বয়স্ক, অসুস্থ ভগিনীদের সেবা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বয়স্ক, অসুস্থ শান্তিভবনের সিস্টারদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যত্ন দিয়ে এ দুর্গম পথযাত্রীদের স্বর্গে পৌঁছে দেবার প্রচেষ্টা চালিয়ে নিয়েছিলেন। তাছাড়া গ্রাম্য দীন-দরিদ্র, মহিলাদের পাট শিল্পের সংগঠনের মাধ্যমে তিনি তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করেন। অনেক পরিবারের দারিদ্র্যতা দূর করেছেন। এতে অনেক দরিদ্র ছেলেমেয়ে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পেয়েছিল।

মৃত্যু শয্যায় দেখেছি সিস্টার তেরেজা কত ধৈর্য্যশীল ও কত কষ্ট সহিষ্ণু। মৃত্যুর দুই মাস পূর্বে পড়ে গিয়েছিলেন এতে তাঁর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়, তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন, অত্যন্ত ব্যথায় তিনি কাতর কিন্তু তার চোখে জল দেখি নাই। তাঁর মুখে ছিল এ বাণী Jesus I love you. Jesus I Praise you.

তাছাড়াও তিনি সংঘকর্ত্রী ও মন্ত্রণা পরিষদকে তার সুন্দর বাণী দিয়েছিলেন যা আমাদের সংঘের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদের ভগিনীগণ তাকে দেখতে এলে তিনি আমাদেরকে ভাল থাকতে বলতেন। আমরা এ মহৎ অপূর্ব ব্যক্তিকে কখনও ভুলব না, ভুলবনা। এখনও মনে হয় সিস্টার তেরেজা আমাদের পাশে আছেন। তার সাথে মন খুলে কথা বলব।

বৈচিত্র্যময় সেবার মাধ্যমে তিনি আমাদের প্রাণ প্রিয় সংঘকে অনেক উচ্চমার্গে তুলে নিয়েছেন। তিনি আমাদের নব্যামাতা, তিনি আমাদের অনেকের জীবনে উজ্জ্বল নক্ষত্র। স্বর্গীয় পিতার কাছে প্রার্থনা তিনি যেন তাকে তাঁর সান্নিধ্যে রাখেন ও তাঁর আর্দশে জীবন যাপন করতে আমাদের শক্তি দান করেন॥ ৯

মহিয়সী নারী তুমি, ধন্য তোমার জীবন

সিস্টার মেরী দীপ্তি এসএমআরএ

ভূমিকা: ধন্য তোমার জীবন, পুণ্য তব জীবন। জীবন তোমার সার্থক, তোমার চেতনা, ভালোবাসা, সেবাযত্ন,দক্ষ ও নিপুণ পরিচালনা দানে। তোমাকে নিয়ে কিছু লিখবো তা কখনও ভাবিনি। অবাক হচ্ছি নিজেই। কি করে সাহস হলো তোমাকে নিয়ে লেখার। সত্যি, তুমি এমন একজন ব্যক্তি তোমাকে নিয়ে যদি কিছু না লিখি তবে ধিক্ আমার জীবন সাধনা। তুমিই তো আমাকে পথ দেখিয়েছ, বুঝতে শিখিয়েছ, অনুপ্রাণিত করেছ এবং প্রতিনিয়ত নিভৃতে নিরালায় আমার পাশে পাশে থেকে আমার চলার পথকে সার্থক ও সুগম করে তুলেছ। তোমাকে জানাই আমার প্রাণের অফুরন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাপূর্ণ প্রণাম। তোমার আদর্শই হোক আমার শক্তি, সাহস ও প্রেরণার উৎস। তোমার মত আমিও যেন প্রতিনিয়তই বলতে পারি I Love you Jesus, I Praise you Jesus. কে তুমি? তুমি তো আর কেউ নও-সংঘের রত্ন-সিস্টার মেরী তেরেজা।

পরিচয়ের সূত্রপাত: সে অনেক দিন আগের কথা। আমি সবে মাত্র ৭ম শ্রেণীতে পদার্পণ করেছি। তুমিলিয়া হোষ্টেলে এসে পড়াশুনার খুবই ইচ্ছে, কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে প্রায় তিন মাস বাড়ীতেই ছিলাম। এরপর মাউছাইদ ধর্মপল্লীর জনদরদী পালপুরোহিত পরম শ্রদ্ধেয় ফাদার ডমিনিক রোজারিও সিএসসি এর পরামর্শে এবং বাবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রাণপ্রিয় ও একান্ত ভালোবাসার মানুষ এবং শ্রদ্ধাভাজন সেই জনদরদী মাদার আগ্নেশের পূর্ণ সহযোগিতায় ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সেন্ট মেরীস হোস্টেলে আসি। সামান্য কিছু জিনিসসহ বাবা আমাকে নিয়ে হোস্টেলে আসেন। আমি গেট দিয়ে ঢুকেই প্রথম দু'জন মহিয়সী নারীকে দেখলাম। শুভ্র পোশাক পরিহিত। তাঁরা তো আর কেউ নন-একজন হলেন সিস্টার মনিকা এবং অন্যজন হলেন সিস্টার তেরেজা (যা পরে জানতে পারি)। আমার বাবা ফাদার ডমিনিকের নাম বলতেই একজন দৌড়ে গিয়ে মাদার আগ্নেশকে ডেকে আনলেন। তারপর অনেক কথা অনেক স্মৃতি। সিস্টার তেরেজা আমাকে খুব যত্ন করে ছোট প্রশ্ন করতে করতে নিয়ে গেলেন হোস্টেলে। সিস্টার ইগ্নেসিউসের সাথে দেখা করে হোস্টেলের ভিতরে গেলাম। এরপর ঐ দু'জন সিস্টারকে যত দেখেছি ততই যেন জেনেছি এবং চিনেছি। জীবনের অনেক কিছুই পেয়েছি, শিখেছি তার চেয়েও বেশি।

উত্তম শিক্ষক: হোস্টেলে আসার পরদিনই সেন্ট মেরীস স্কুলে ভর্তি হলাম এবং ক্লাশ শুরু করলাম। অনেক শিক্ষক শিক্ষিকার মধ্যে বেশির ভাগই সিস্টার শিক্ষক। তাদের মধ্যে যাঁকে দেখে আমার মন ভরে গেল তিনি তো হোস্টেলে প্রথম দেখা সেই সিস্টার। উনাকে পেয়ে মনে হলো একজন পরিচিত কাউকে যেন পেলাম। উনি গণিত ক্লাশে ঢোকার সাথে সাথে ক্লাশের সবাইকে বেশ উৎফুল্ল মনে হলো। আমি প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনি। তিনি বেশ সাবলীল ভাষায় বোর্ডে পরিষ্কার ভাবে গণিতের প্রতিটি লাইন বুঝানোর সাথে সাথে লিখছেন। তাঁর শিখানোর ধরণ সবার কাছে খুব গ্রহণযোগ্য। আমি বরাবর গণিতে ভালো থাকলেও উনার শিখানোর পদ্ধতি ও কৌশল এত চমৎকার যে আমি খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরে অন্যদের সাহায্য করতে লাগলাম। শুধু গণিত নয় আস্তে আস্তে জানতে পারি তিনি প্রায় প্রতিটি বিষয়ই খুবই দক্ষতার সাথে শিখাতেন। স্কুলে ছোট বড় বেশির ভাগ মেয়েই তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। আসলে তিনি একজন দক্ষ এবং পারদর্শী শিক্ষিকা। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি অতুলনীয়, সহজবোধ্য অথচ খুবই সাবলীল। তিনি খুবই সৃজনশীলভাবে সবার মন জয় করতে পারতেন। তিনি ছিলেন খুবই অমায়িক। সবাইকে সহজে আপন করে নিতে পারেন। আমিও কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। তিনি সত্যিই একজন উত্তম শিক্ষক। যাঁর কোন তুলনাই হয় না। সত্যিই মহান তিনি যিনি শিক্ষকতার মাধ্যমে অনেককে আলোর পথের নিশানা দেখিয়ে আধ্যাত্মিক ভাবে গড়ে তুলেছেন। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি এতটাই গ্রহণযোগ্য ছিল যে, যতক্ষণ তাঁর দেওয়া শিক্ষাটি নিজেরা করতে সমর্থ না হতাম ততক্ষণ রক্ষা নেই। তিনি সেলাই এ ডিপ্লোমা দিয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। ৭ম শ্রেণীর সেলাই ক্লাশে তাঁর দেওয়া জ্ঞান কতটুকু শিখতে পেরেছি তা যাচাই করার জন্য আমাকে একটা বড় কাপড়ের ব্যাগ তৈরি করতে দিলেন। কাজটি প্রথমবার নিখুঁত না হওয়ায় দ্বিতীয় বার করতে দিলেন। তাতেও পরিপূর্ণভাবে না হওয়ায় তৃতীয়বার তিনি আমাকে দেখিয়ে দিলেন। এবার আমি কাজটি করতে সমর্থ হয়েছিলাম। এতেই বুঝা যায় তার শিক্ষাদান পদ্ধতি কতটা গ্রহণযোগ্য, কৌশলপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত।

আদর্শ সন্ন্যাসব্রতী: সিস্টার তেরেজা জীবনের শুরু থেকেই ব্রতীয় জীবন যাপনে খুবই বিশ্বস্ত এবং অনুরাগী ছিলেন। ব্রতগুলো পালনে যেমনি নিষ্ঠাবান ছিলেন তেমনি অন্যদেরকেও তা পালন করতে সর্বদা অনুপ্রাণিত করতেন। দরিদ্রতা ও বাধ্যতা ছিল তার জীবনের ভূষণ। নিজে যেমন কঠোর ছিলেন সংঘের সবাইকে সে ক্ষেত্রে সর্বদা সতর্ক করতেন। কৌমার্য জীবনের প্রতি তিনি খুবই অনুগত এবং বিশ্বস্ত সন্ন্যাসব্রতী। তার জীবন সবার কাছে আদর্শ স্বরূপ।

দক্ষ হিসাব রক্ষক: পরিচয়ের প্রথম থেকেই দেখেছি উনি শিক্ষকতার পাশাপাশি স্কুলের এবং সংঘের হিসাব সংরক্ষণে দক্ষতার সঙ্গে সহায়তা করছেন। খুব নিখুঁত ও নিপুনভাবে প্রতিটি কাজ তিনি করতেন। সংঘের হিসাব সংরক্ষণে প্রতিটি আশ্রমে সিস্টার মণিকার সাথে সহায়তা করেছেন। পরবর্তীতে বিদেশে লব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে নতুন আঙ্গিকে সংঘের হিসাব সংরক্ষণের সূত্রপাত করেন। শুধু নিজে নয় কিন্তু প্রত্যেককে একই ধারায় অগ্রসর হওয়ার জন্য বিভিন্ন সেমিনারের সময় তা পরিষ্কার এবং নিখুঁতভাবে বুঝিয়ে হাতে কলমে তা করতে অনুপ্রাণিত করেন। ফল-স্বরূপ গোটা সংঘের মধ্যে এক্ষেত্রে নতুন চিন্তা চেতনার উদ্ভব হয়। যার ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত রয়েছে। তাইতো প্রতি পদক্ষেপে স্মরণ করি তাকে।

সৃজনশীল গঠনদাতা: ১৯৬৭ খ্রিস্টবর্ষে শিক্ষকতার পাশাপাশি মাদার আগ্নেশ তাঁকে পোষ্টুলেন্টদের দেখাশুনা এবং গঠনের দায়িত্ব দেন। তিনি নব্যা পরিচালিকা সিস্টার মেরীলিনের সঙ্গে সর্বাত্মক সহায়তা করে

পোষ্টলেন্টদের গঠন দিতে শুরু করেন। তিনি তাঁর চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা তাদের জন্য উজার করে দিতে থাকেন। ঈশ্বর তাঁর এ কাজে নিশ্চয়ই প্রীত ছিলেন। তাইতো সংঘ প্রধানের মাধ্যমে পরবর্তী বছরেই আধ্যাত্মিক নবায়নের জন্য তাকে ফিলিপাইনে পাঠানো হয় উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য। সেখানে থাকাকালীন সময়ে যে সিস্টারদের সাথে তিনি থেকেছেন এবং শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে যেন সমন্বয় খুঁজে পান। এছাড়াও ওখানে থাকাকালীন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংঘের ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের সংস্পর্শে এসে নিজে এতটাই অনুপ্রাণিত হয়েছেন যে, দেশে ফিরে ভগিনীদের মধ্যে তা সহভাগিতা করার নবতর এক প্রেরণা লাভ করেন। ফিলিপাইনের লব্ধ জ্ঞান এবং অন্তর অনুপ্রেরণায় তিনি যা কিছু লাভ করেছেন তার সবটুকুই তিনি উজার করে দিয়েছেন। ওখান থেকে ফিরেই নব্যা পরিচালিকার দায়িত্বের পাশাপাশি জুনিয়র সিস্টারদের দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়। একই সাথে বেশ কয়েক বছর তিনি মাতৃগৃহে আশ্রম পরিচালিকার দায়িত্বও পালন করেন। ঐ সময়ই সংঘ পরিচালিকা সিস্টার মেরীলিনকে গঠনকাজসহ সব ব্যাপারেই পূর্ণ সহায়তা দিতে সচেষ্ট হন। এতেই বুঝা যায় তিনি একাধারে কতগুলো দায়িত্ব পালন করেছেন। কোন ব্যাপারেই তাঁর কিন্তু বিন্দুমাত্র কার্পণ্য ছিল না। আসলে সিস্টার ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি। তাইতো প্রতি পদক্ষেপেই তিনি সবাইকে বলতেন-"আমার যে সব দিতে হবে সেতো আমি জানি।" আবার দিতে গিয়েও যেন কোন কার্পণ্য না থাকে বা যেমন তেমন কাজ না হয়। তাই তিনি সর্বদাই হাতের নিপুণ সেবা দেবার কথাই উচ্চারণ করতেন। তিনি যা বলতেন তা তিনি নিজে বাস্তবে করতেন। গোটা সংঘকে তিনি একই চিন্তা ধারায় গঠনের জন্য দলে দলে সেমিনারের আয়োজন করতেন। সে সময়ে সংঘে নতুন জাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল সবার মধ্যেই। সব কিছুতেই যেন তাঁর হাতের স্পর্শ ছিল। নব্যা পরিচালিকা হিসেবে তিনি প্রতিটি কাজ সবাইকে নিয়েই করতেন। প্রার্থনায়ও নতুনত্ব এবং সৃজনশীলতার পরিচয় দেন। বড়দিন ও বিভিন্ন উৎসবাদিতে কিভাবে বয়োজ্যেষ্ঠ ও অন্যান্য ভগিনীদের আনন্দ দেওয়া যায় নবীনা সিস্টার ও নব্যাদের নিয়ে তাই করতেন। সবকিছুতেই তাঁর সৃষ্টিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সবাইকে সব কিছুতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করতেন। কোন কিছুতে কেউ যেন পিছে পড়ে না থাকে সেদিকে নজর দিতেন। তিনি প্রতিজন ব্যক্তিকে তার মেধা এবং দক্ষতা অনুযায়ী এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করতেন। আধ্যাত্মিক দিক থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি সহায়তা করতেন। আসলে তিনি একজন সত্যিকারের আদর্শ এবং উত্তম গঠনদাতা। তিনি প্রতিজন ব্যক্তিকে জানতেন, চিনতেন এবং বুঝতেন। কেউ তার কাছে অবহেলিত ছিল না। কোন ভুল করলে অবশ্যই তা সংশোধন করতেন। কখনও কাউকে তিরস্কারের ভাব নিয়ে কিছু বলতেন না। সমালোচনা মোটেই পছন্দ করতেন না। কেউ তা করুক তাও তিনি চাইতেন না। এইতো ছিল তার জীবন।

সংঘের কর্ণধার: সময়ের পূর্ণতায় সংঘের কর্ণধার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সিদ্ধহস্তে। সংঘের এক যুগান্তকারী নবায়নের সূত্রপাত ঘটান। যা তিনি দায়িত্ব পাবার পূর্ব থেকেই সংঘকর্ত্রীর সাথে একাত্ম হয়ে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল দৃঢ় মনোবল এবং ভালোবাসার কথা। সাধু যোহনের ন্যায় প্রতিটি আশ্রম পরিদর্শন কালে সেমিনার বা অন্য কোন সমাবেশে একই অনুরোধ ছিল। আমরা যেন পরস্পরকে ভালোবাসি এবং প্রতিটি আশ্রমগৃহকে করে তুলি শান্তির নীড়। বাইরে থেকে কঠিন কঠোর এবং রাশভারী প্রকৃতির মনে হলেও তিনি ছিলেন এক কোমল প্রাণ হৃদয়ের মহিয়সী নারী। অন্যের দুঃখ কষ্টে তিনি একাত্মতা প্রকাশ করতেন। তাঁর হৃদয়ে প্রত্যেকের জন্য বিশেষ স্থান ছিল। মন্ডলীর আইন, দ্বিতীয় ভাটিকানের পরবর্তী সব নির্দেশনাগুলো ছিল তার নখ দর্পণে। তিনি স্টাডি করে নোট করে রাখতেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী থাকায় সব কিছু খুব সহজেই বুঝতে এবং মনে রাখতে পারতেন। বাইবেলের বাণীর প্রতি ছিল গভীর টান ও ভক্তি। প্রতি ক্ষেত্রেই বাইবেলের বাণী সংবিধান নিয়েই কথা বলতেন। সংঘের কর্ণধার হলেও কোন কাজকেই তিনি হেয় বা তুচ্ছ করতেন না। কোন কাজ তার অজানা থাকলে অন্যের সহায়তা নিতেও কখনও কার্পন্য করেননি। ভগিনীদের মধ্যে যার যেদিকে ঝোঁক বা পারদর্শীতা দেখতে পেতেন তাকে সেভাবেই পরিচালনা দিতেন।

নবায়নের অগ্রদূত: ফিলিপাইন থেকে ফিরে তিনি সংঘের পরিস্থিতি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয় ভাটিকান পরবর্তী কিছু ভুল ধারণার কারণে সংঘের মধ্যেও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। জাগতিকতার কারণে আধ্যাত্মিক নবায়নের কথা সবাই ভুলেই যাচ্ছিলেন। এ হেন পরিস্থিতিতে সিস্টার তাঁর অর্জিত জ্ঞানের ভাণ্ডার উজার করে দিয়ে দ্বিতীয় ভাটিকানের আসল ব্যাখ্যা বাইবেলের দৃষ্টিকোন থেকে পরিষ্কার ধারণা দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। যার ফলে সবাই জাগতিক মোহের অবসান ঘটিয়ে আধ্যাত্মিক নবায়নের জন্য বেশি আকর্ষিত হয়। এ কঠিন বাস্তবতা তিনি খুব সহজ স্বাভাবিক ভাবেই মোকাবেলা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাইতো তাঁকে নবায়নের অগ্রদূত বললে নিশ্চয়ই ভুল হবে না। তাইতো তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কথা সংঘ যুগে যুগে কালে কালে স্মরণ করবে "ধন্য তোমার জীবন"।

আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ: সিস্টারের সাথে পরিচয়ের দিন থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, তিনি একজন আধ্যাত্মিক নারী। তাঁর হাঁটা চলা কথা বার্তার মধ্যে সব সময় একটি উজ্জ্বল আলো যেন জ্বলতে থাকে। শত কাজের মাঝেও সিস্টার প্রার্থনাকে প্রধান্য দিতেন। সকাল, দুপুর, বিকেল প্রতিবারই দীর্ঘ সময় প্রার্থনায় কাটাতেন। কোথাও যাবার সময়েও তিনি নীরবে প্রার্থনায় দীর্ঘ যাত্রার সময় ব্যয় করতেন। ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার আদর্শই তিনি তাঁর ছোট বড় কাজের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতেন। শান্তি ভবনে কাজ করার সময়ে এবং জীবনের শেষ দিন গুলোতে অধিক সময় চ্যাপিলে থেকে ঐশবাণী ধ্যান ও নীরব প্রার্থনায় কাটাতেন। আমাদেরকেও তিনি প্রতিনিয়ত আধ্যাত্মিকতায় বেড়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করতেন। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। তাঁর সন্ন্যাব্রতীয় জীবন সবার কাছে অনুকরণীয়। সার্থক তাঁর ব্রতীয় জীবন।

মিলনের সেতু বন্ধনকারী মহিয়সী নারী: সিস্টার তেরেজা কখনও একজনের কথা অন্যজনের কাছে বলতেন না বা কারো সমালোচনা করতেন না। এধরণের কাজকে তিনি পচা মাছ বিক্রির সঙ্গে তুলনা করতেন। তিনি প্রত্যেকের কথাই গভীর মনোযোগের সাথে শুনতেন। যার যার অবস্থা অনুযায়ী পরামর্শ দিতেন। প্রয়োজনে বিভিন্ন অনুশীলনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপায় বলতেন। পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি হলে উভয় পক্ষের সমস্যা শুনে সমাধান দিতেন। কাউকে কোন কারণে তিরস্কার করতেন না। ভুল করলে অবশ্যই কঠোর হতেন কিন্তু ব্যক্তি যেন নিজের ভুল বুঝে সেজন্য অনুপ্রাণিত করতেন। প্রতিনিয়ত তিনি অভিনব কৌশলে সব কিছু সমাধান দিতেন।

বয়োজেষ্ঠা ও অসুস্থদের সেবাকারিনী: সংঘ পরিচালিকা থাকাকালীন বিভিন্ন বলিষ্ঠ পদক্ষেপের মধ্যে সংঘের বয়োজেষ্ঠা ও অসুস্থ ভগিনীদের কথা চিন্তা করে শান্তিভবন স্থাপনের চিন্তা করে মাতৃগৃহকেই শান্তির আবাস হিসেবে বেছে নেন। আর সেই কাজকে সিদ্ধহস্তে করার জন্য সংঘ পরিচালিকার দায়িত্বের পরবর্তী সময়ে শান্তিভবনে ভগিনীদের সেবার দায়িত্বটি বেছে নেন। আর সত্যিই তিনি সেই দায়িত্ব আমরণ পালনে ব্রতী ছিলেন। শেষের দিকে কষ্ট হলেও ভগিনীদের পাশে থেকে সময় ব্যয় করতেন। তাঁদের সব ধরণের প্রয়োজন মিটাতেন। কেউ যেন কোন কিছু থেকে বঞ্চিত না হন। তাদের জন্য খেলাধূলা, আনন্দ উৎসব, বাৎসরিক ছোটখাটো ভ্রমণ এমনকি প্রবীণ দিবস পালনের মাধ্যমেও তাদের আনন্দ দিতেন। তাইতো তারা অনেকেই "তেরেজা মা" বলতে দ্বিধা করতেন না। আর সত্যিই তো তিনি তাই।

নতুন পদক্ষেপের অগ্রনায়ক: সিস্টার তেরেজা সংঘপ্রধান ও তার সহযোগীদের সাথে সমন্বয় রক্ষা করে অনেক নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যা আজও চলমান। বিভিন্ন জয়ন্তী উৎসব, সংঘের ইতিহাস রচনার সূত্রপাত, সংবিধান নবায়নের পদক্ষেপ বিভিন্ন

সেমিনারের ব্যবস্থা, হিসাব সংরক্ষণ সহ আরও নানা ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যা আজও চলমান।

দরিদ্রদের সহায়তাকারী: সমাজে অবেহেলিত, দরিদ্র নারীদের জীবন যাপনের মান উন্নয়নসহ তাদের কর্মসংস্থানের জন্য সব সময় চিন্তা করেতেন। তাইতো জাগরণীর সাথে যুক্ত হয়ে দুঃস্থ মহিলাদের জন্য কাজ করেছেন। হাতের কাজ, পাটের কাজ শিখিয়ে তার মাধ্যমে পূর্ণ সহায়তা করেছেন। এছাড়াও তাদের পারিবারিক উন্নয়নের পর কিভাবে সঞ্চয় করা যায় সে ক্ষেত্রেও তিনি সহায়তা করতেন। তাঁর দূরদর্শী চিন্তা চেতনায় অসহায় নারীরা তাদের জীবন যাপনের মান উন্নয়নে সক্ষম হয়েছে।

কষ্ট সহিষ্ণু: সিস্টার তেরেজা কখনও কাউকে কোন কষ্টের কথা সহজে বলতেন না। সব কিছু ঈশ্বরে সমর্পণ করতেন। সংঘের বড় বড় সমস্যায়ও দেখেছি ধীর স্থির থেকে সব কিছুর মোকাবেলা করতে। তাঁর কষ্ট সহজে কাউকে বুঝতেও দিতেন না। তাইতো দেখা যায় জীবনের শেষ সময়ে তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। আসলে একজন আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি না হলে কিছুতেই তা সম্ভব হতো না। তার মুখে সব সময় শুনা যেতো "Jesus I Love you, Jesus I Praise you." ঈশ্বরের ভালোবাসায় আত্মসমর্পণই ছিল তার জীবনের একমাত্র সাধনা।

চিন্তাশীল ব্যক্তি: ঈশ্বর তাঁকে যে মেধাশক্তি দিয়েছেন তিনি তাঁর সবটুকুই উজার করে দিয়েছেন সংঘের জন্য। সংঘকে তিনি ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে। তাইতো সব সময় তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতেন, ভাবতেন এবং অন্যদের বিশেষ ভাবে উর্ধ্বতন কর্ত্রীপক্ষের সাথে সহভাগিতা করতেন। তাঁর কথাবার্তায় সব সময় তা-ই ফুটে উঠতো। অনেকের কাছে তা সব সময় গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি বলে বিরূপ চিন্তা করতেন। সিস্টার বলতেন, সবার ভালোবাসা চিন্তা চেতনায় সংঘটি যেন আধ্যাত্মিকতায় আরও উচ্চ মার্গে উন্নীত হতে পারে। এ ধরণের চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা আরও অনেক কিছু আহরণ করতে পারতাম। কিন্তু অজ্ঞতার কারণে আমরা তা পারিনি। আমরা কি পারবো আরও এরকম সিস্টার তেরেজাকে খুঁজে পেতে?

নীরব কর্মী: সিস্টার তাঁর অন্যান্য কাজের ব্যস্ততার মাঝে এমন কিছু কিছু কাজ করেতেন যা কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না। সমবেত আলাপচারিতার সময় তিনি কথা হাসি ঠাট্টার মাঝেও নানা ধরণের উলের, ক্রুশির কাজ করতেন। এগুলো সাধারণত প্রত্যন্ত দরিদ্র এলাকার ভাইবোনদের জন্য দিতেন। রোজারিমালা তৈরী শান্তিভবনের সিস্টারদের বসার জন্য ছোট ছোট কুশন ও কভার এগুলো তৈরী করে তাদেরকে একটু আরাম করে বসার জন্য দিতেন। এছাড়াও সংঘের সিস্টারদের জন্য সংঘে প্রবেশের, মৃত্যুর এসব তথ্যের পরিপূর্ণ রেকর্ড খুব সুন্দর ভাবে সংরক্ষণ করতেন। যদি কারো কাছ থেকে সংঘের কোন তথ্য জানতেন তাও লিপিবদ্ধ করতেন। এসব কাজগুলো সিস্টার নিরালায় নিভৃতেই করতেন।

উপসংহার: আমি যদি লিখতে থাকি তবে প্রতিনিয়তই লিখে যাবো কারণ তাঁকে নিয়ে তো লেখার শেষ নেই। তাঁর অপরিসীম গুণের কথা বলে শেষ করার মত নয়।

সিস্টার ছিলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একজন ব্যক্তি, কর্তব্যপরায়ন, ন্যায়পরায়ণ, পরিশ্রমী, সৃজনশীল, উদ্যমী এবং ভালোবাসার একজন মানুষ। আজ তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা। আমি, আমি হবার পিছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাই তো আজ দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে ...

তোমাকে হারিয়ে হারালাম এক রত্ন,
ভেবে কষ্ট হচ্ছে কেন করিনি তোমার যত্ন।
জানি ও বিশ্বাস করি আছো তুমি পিতার স্নেহাশ্রয়ে,
আশীর্বাদ করো পারি যেন চলতে তোমার আদর্শের আশ্রয়ে।

ধন্য তোমার জীবন, পুণ্য তোমার সাধনা,
প্রিয় সংঘটি বেড়ে উঠুক নিয়ে তোমার চিন্তা-চেতনা।
ওগো ধ্রুব-তারা তুমি, তাইতো তোমায় মোরা নমি।।

সত্যিইতো আমি দেখেছি তাঁকে

সিস্টার মেরী সীমা এসএমআরএ

ঈশ্বর ত্রাণকর্তার আগমন সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি যুগে যুগে কিছু মহাপুরুষের আগমন ঘটিয়েছেন। ঈশ্বরের এমনি এক বিশেষ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিশেষ সৃষ্টি হলেন আমাদের শ্রদ্ধেয়া সিস্টার মেরী তেরেজা এসএমআরএ।

স্রষ্টার এক অপরূপ সৃষ্টি সন্ধ্যা। ফুটফুটে ছোট্ট সুন্দরী সন্ধ্যা হাঁটি হাঁটি পা পা করে বড় হয়ে ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বিদ্যালয়ে পা রাখলেন। তার বুদ্ধিমত্তা, বলিষ্ঠকণ্ঠ ও তৎপরতা বিদ্যালয়ের সবার দৃষ্টি কেড়ে নিলো। ক্লাসে সন্ধ্যা জটিল কঠিন গণিত সমাধানে ছিলো দক্ষ ও পটু, কেউ তাঁকে কোনদিন হারাতে পারেনি। এ কথা আমি নিজের কানে সামনাসামনি শুনেছি- দড়িপাড়া গ্রামের তৎকালীন সিলভেস্টার মাস্টারের (ছিলু মাস্টার) কাছ থেকে।

এমনি এক বুদ্ধিদীপ্ত তেজস্বী মেয়ে আস্তে আস্তে বড় হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলো। সুন্দরী সন্ধ্যা এসএসসি পাশ করে সংসারের সমস্ত আকর্ষণ উপেক্ষা করে চলে এলেন সিস্টার হবার উদ্দেশে। ইচ্ছার দৃঢ়তা এবং গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে খ্রিস্টেতে আত্মনিবেদন করে সন্ধ্যা হয়ে উঠলেন সিস্টার মেরী তেরেজা এসএমআরএ। ক্রমেই তিনি পবিত্র আত্মার আলো ও শক্তিতে এবং খ্রিস্টের আদর্শে পরিপুষ্ট হয়ে উঠতে থাকেন। স্রষ্টা যে সুন্দর ফুলটি এসএমআরএ সংঘের বাগানে ফুটিয়েছেন সেই ফুলটি বিভিন্ন গুণের সমাহারে ছিলো সুবাসিত। ঈশ্বরের দেয়া বিভিন্ন গুণাবলী তিনি কঠোর সাধনায় অতি যত্নে লালন পালন করেছেন এবং সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণে তা প্রয়োগ করেছেন। তার আধ্যাত্মিকতা এবং আদর্শের বীজ বুনে দিতে তিনি হলেন নব্যাদের পরিচালিকা। গুরুগম্ভীর, কর্তব্য পরায়ণ, শ্রমপ্রিয় নীতিনিষ্ঠ সিস্টার তেরেজা মানুষ গড়ার কাজ করতে করতে পরবর্তীতে হয়ে উঠলেন এসএমআরএ সম্প্রদায়ের কর্ণধার। ঈশ্বর তার হাতের তালুতে যে নকশা একে রেখেছেন তা তো আর ব্যতিক্রম হবার নয়। দক্ষ হাতে সম্প্রদায় পরিচালনা করেছেন বারোটি বছর।

সিস্টার তেরেজার দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে এবং পরবর্তী সময়ে আমি কাছে থেকে দূর থেকে যে ভাবে দেখেছি, শুনেছি তার মধ্যে আবেলের সরলতা, নোয়ার পবিত্রতা, যাকোবের ধৈর্য্য, যোসেফের শুদ্ধতা, দাউদের মৃদুতা, এলিয়ের উদ্যোগ ও মাকাবীয়ের বীর্য।

দেখেছি দরিদ্রতার সৌন্দর্যে মণ্ডিত এক সাধারণ অথচ অসাধারণ জীবন যাপনে এক সন্ন্যাসব্রতীকে। দারিদ্র্যতাকে তিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে গ্রহণ করেছেন যা তিনি বাস্তব জীবন যাপনে দেখিয়েছেন।

মনে পরে আমি যখন এ্যাসপাইরেন্ট ছিলাম মেরী হাউজে তখন শাড়ীর একদিকে একটু ছিড়ে যাওয়ায় কাকার কাছে শাড়ী চেয়েছিলাম। কাকা শাড়ী নিয়ে আসার পর তা সিস্টার আমার হতে দেননি। ছেড়া শাড়ীটা এনে নিজ হাতে তা রিপু করতে শিখিয়েছেন এবং আর পাঁচ মাস পরার যেগ্য করে দিয়েছেন। তখনই আমি শিখেছি কিভাবে আরো মিতব্যয়ী হয়ে চলতে হয়। পরবর্তীতে সিস্টার হয়ে দরিদ্রতা ব্রত পালনে এই ঘটনা আমার অনুপ্রেরণার উৎস ছিলো। দেখেছি সারা বছর এক জোড়া সাধারণ কম দামী সেন্ডেল পরতেন। এভাবে তিনি দরিদ্রতাকে সমস্ত ধন

ও আকর্ষণ থেকে অধিক মূল্যবান বলে নিজ জীবনে কার্যকরী করতে চেষ্টা করেছেন।

প্রার্থনাশীল এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হিসেবে তাকে দেখেছি। শত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রার্থনাকে সর্ব প্রথমে স্থান দিয়েছেন। দীর্ঘ সময় প্রার্থনা ও ঐশবাণী ধ্যানে মগ্ন থেকে ঈশ্বরের সাথে যোগসূত্র তৈরী করে অন্তরের নিভৃতস্থানে একটি ঈশ্বরের আবাস তৈরী করে প্রভুর সান্নিধ্যে আনন্দে ছিলেন।

দেখেছি তাকে বিশ্বস্ততার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে। মনে পড়ে আমার ঠাকুরমা যিনি সিস্টারের বড়মা, খুব অসুস্থ ছিলেন। আমাকে বাড়ীতে দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন আমি নবীস, বাড়ীতে কিছু খেতে পারবে না বলে তিনি বাড়ীতে জলের গ্লাসটা পর্যন্ত স্পর্শ করেন নি।

শুদ্ধতার প্রতিচ্ছবি রূপে তাকে দেখেছি। ধর্মগুণে শোভিতা হয়ে অতি শুদ্ধভাবে জীবন যাপন করেছেন তিনি। নিজ শুদ্ধতা রক্ষায় তিনি ছিলেন এক শক্তিশালী সংরক্ষক। নিজ জীবনে তা তিনি মূল্যবান সম্পদে ও যত্নে গচ্ছিত রেখেছেন। কোন প্রলোভন পরীক্ষায় তিনি হেরে যাননি। আর এতেই তিনি হয়ে উঠেছেন আরো অধিক ঈশ্বরপ্রেমী। সূর্যের আলোর মতোই নিজ শুদ্ধতায় তিনি ছিলেন ঝলমলে এক উজ্জ্বল নারী। শুদ্ধ হৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের দর্শন পাবে (মথি: ৫:৮)। বিশ্বাস করি সিস্টার স্বর্গীয় আনন্দে পিতার রাজ্যে রয়েছেন।

দেখেছি অসহায় দরিদ্রদের এক আশার আলো হিসেবে। গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের নিয়ে তিনি কি কঠোর পরিশ্রমই না করেছেন। পাটের কাজ, বিভিন্ন হাতের কাজ নিজ হাতে শিখিয়ে গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের ভাগ্য উন্নয়নে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। শত দারিদ্রের মধ্যে হতাশ, নিরাশ না হয়ে জীবন পথে চলার সাহস যুগিয়েছেন তিনি। দেখেছি তার দূরদর্শিতা। বিভিন্ন দায়িত্ব কর্তব্য পালনে তিনি অতি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। গভীর ভাবে চিন্তা করে পুর্বাপর ভেবে শান্ত মনে কথা বলেছেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ঈশ্বর যাকে বিশেষ ভাবে মনোনীত করেন তাঁকে বিশেষত্ব দিয়েই সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের হাতে এক বিশেষ সৃষ্টি ছিলেন সিস্টার তেরেজা। এই বিশেষত্ব দিয়েই জীবিতকালে আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য সেবা দিয়ে গেছেন। ঈশ্বর তার এই সেবিকাকে নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করেছেন। বিশ্বাস করি তিনি স্বর্গে রয়েছেন এবং স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করছেন ও করে যাবেন॥

ওগো মা, তুমি একজন জননী

সিস্টার মেরী পুষ্প এসএমআরএ

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সিস্টার মেরী তেরেজার সান্নিধ্যে প্রবেশ করি। তিনি মাতৃতুল্যের চেয়েও অধিক আন্তরিক ভালোবাসা ও যত্ন নিয়ে গ্রহণ করেছেন। তাইতো তাকে মা জননী বলা ভুল হবে না। এই যে গ্রহণ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মায়ের যত্নের কোন শেষ ছিল না। কথায় আছে- "শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে" আমাদের মা জননী তেমনি ছিলেন। ঈশ্বর এ মানুষকে ভালোবেসে এমনিভাবে সৃষ্টি করেছিলেন যা বর্ণনাতীত। এমন মানুষের সাথে থাকা শিক্ষা গ্রহণ করা ভাগ্যের ব্যাপার। শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত বাবা-মায়ের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। তাই তিনি বাবা-মায়ের মেধা নিয়ে এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। আর মায়ের স্নেহ-যত্নে সেইভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছিলেন। মায়ের চেষ্টা ছিল উৎসর্গীকৃত জীবনে প্রবেশ করা-কিন্তু তার জীবনে সেটা না হওয়ায় তার এই ফুলটিকে ঈশ্বরের চরণে সঁপে দিয়েছিলেন, আর সেই ফুল, খুশি-মনে প্রভুর চরণে নিবেদিত হয়েছিলেন স্ব-ইচ্ছায়, আর এই নিবেদন তিনি বিশ্বস্ততার সাথে পূর্ণ হৃদয় মন নিয়ে যাপন করে গেছেন।

মা জননীকে যেমন দেখেছি: দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণ, ন্যায্য, সত্যের জন্য নিজেকে দেওয়া, কঠোর পরিশ্রমী, পুঁথিগত বিদ্যার,পাশাপাশি বৈষয়িক জ্ঞান। সৎ, দয়ালু, বিবেচক, ত্যাগী। বাইরের দৃষ্টিতে দেখলে মনে হতো , বা তার দৃষ্টি দেখলে মনে হতো তিনি অনেক কঠোর প্রকৃতির কিন্তু তার কাছে পৌছলে বোঝা যেত তিনি কতো উদার। তিনি অন্যকে দিতে পছন্দ করতেন যেমন যে কোন ধরণের শিক্ষা। তিনি অংকের শিক্ষক বলে এক নাম্বার ছিলেন কিন্তু বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস কোন কিছুতেই তার অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়নি, তেমন ব্যক্তি তিনি ছিলেন।

নভিসিয়েটের সময়গুলো: ছয় মাস পোষ্টুলেন্সি, দুই বৎসর নভিসিয়েট। দুইজন নভিসিয়েট শুরু করেছিলাম। দুইজনকে তিনি এমনভাবে ব্রত জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন যা অন্তরে গেঁথে রাখার মত। দুইজন বলে কোন দিন ক্লাস না নেওয়ার একটা মনোভাব দেখিনি। যা যা শিক্ষা দেওয়ার তা তিনি নিষ্ঠার সাথে করেছেন। তিনি বিজ্ঞ মানুষ ছিলেন। বাইবেল, ভাটিকান-২ উনার যেন মুখস্থ ছিল।

ব্রত পালন সম্বন্ধে তিনি যেভাবে প্রস্তুত করেছিলেন , মাঝে মাঝে চিন্তা করে ভয় পেয়ে যেতাম। এমন বিশ্বস্তভাবে পালন করতে পারবো কিনা। তিনি সাহস যোগাতেন পরামর্শ দিয়ে শক্তি যোগাতেন, তার শিক্ষা, জীবন আদর্শ নিয়ে চলার পথে চলতে সাহস পেয়েছি।

ক্ষমাশীল জননী: অনেক বড় দোষ, অপরাধ করে যদি সত্যিটা ওনার কাছে প্রকাশ করেছি, তিনি তা ক্ষমা করে যেটা সঠিক পথ সেটাই দেখিয়ে দিতেন এভাবে অনেকবার মাতৃহৃদয়ের দেখা পেয়েছি।

দক্ষতায় পূর্ণ: বাগান করা, সেলাই করা, কত ধরনের ফুল যে তিনি বাগানে ফুটিয়েছেন আমাদের নিয়ে এক গাছের ছাল নিয়ে অন্য গাছে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের গোলাপ তিনি বানিয়েছেন। যেখানে যা দেখেছেন সবই তিনি শিখে নিয়েছেন। সেলাই কাজে এমন দক্ষ, পুরোহিতদের কাপড় যেমন চ্যাজাবল, আলফ্, ষ্টোল, বিশপদের ব্যবহারের জন্য মাইটার তিনি নিজে করেছেন এবং আমাদের দিয়ে করিয়েছেন। যত রকমের এমব্রয়ডারী সব কিছুতেই পারদর্শী ছিলেন। গরীব মায়েদের নিয়ে পাটের কাজ করিয়ে তিনি মহিলাদের কর্ম সংস্থান করেছেন।

সংঘের দায়িত্বে: সংঘের বিভিন্ন গ্রুপের সিস্টারদের সেমিনার একা চালিয়েছেন। অলসতা তার মধ্যে ছিলনা। নবীস মিসট্রেস সেই সঙ্গে প্রতিটি আশ্রম পরিদর্শনে সুপিরিয়র জেনারেলকে সাহায্য দেওয়া, হিসাব রক্ষকের কাজ করা, তিনি সবই এক হাতে করেছেন, তখন ছিলনা কম্পিউটার, ক্যালকুলেটর তিনি তার বুদ্ধিদীপ্ত মাথা দিয়ে সব করে গেছেন, তাহলেই বুঝতে পারি তাঁর মেধা কত তীক্ষ্ণ ছিল।

প্রার্থনার জীবন: প্রার্থনা ছিল ওনার জীবনের প্রধান খাদ্য। প্রার্থনায় ওনাকে কোনদিন অবহেলা করতে দেখিনি। এত নির্ভরশীল ছিলেন ঈশ্বরের প্রতি। সিস্টারদের তিনি এভাবেই গঠন দিয়েছেন। যখন অচল হয়ে পড়েছেন লম্বা সময় ধরে চ্যাপিলে বসে তিনি প্রার্থনা করতেন। তিনি যিশুর সান্নিধ্যে থাকতে পছন্দ করতেন। এমন মহিয়সী নারীকে কেনা ভালোবাসবে? তার বর প্রভু তাকে সত্যিই ভালোবেসেছেন।

বারটি বছর: একটানা বার বছর সুপিরিয়র জেনারেল হিসেবে এসএমআরএ সংঘকে তিনি শক্ত হাতে, বিজ্ঞতার সাথে পরিচালনা করে গেছেন। যখন তিনি অব্যাহতি পেলেন, এত বছর যা তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই পথে তিনি নেমে পড়লেন শান্তি ভবনের বয়স্ক সিস্টারদের সেবা যত্ন করার জন্য। নিপুণ হাতে তাদের পাশে থেকে তাদের সাক্রামেন্তীয় যত্ন, শারীরিক

পুষ্টি, অসুস্থতার জন্য উপযুক্ত ঔষধ, ডাক্তার ও সেবা সবই তিনি খেয়াল রেখেছেন। অসুবিধায় পড়লে ডাক্তার নার্সদের শরণাপন্ন হতেন সব দিকে তিনি সচেতন ছিলেন। কোন সিস্টার মৃত্যু শয্যায় থাকলে পাশে বসে তাকে স্বর্গের পথে যাওয়ার প্রস্তুতি দিতেন। কানে কানে জোরে জোরে প্রার্থনা উচ্চারণ, পুরোহিত ডেকে রোগীলেপন, কমূনিয়ন দেওয়া এ সবের মাধ্যমে তিনি সবাইকে বিদায় দিয়েছেন।

শেষ সময়ঃ আমি তুমিলিয়াতে রুটিন মতো পাঠদানের পর মাতৃজননীকে সাক্ষাৎ দিতে যখনই যেতাম তখনই দেখতাম ব্যথার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। একদিন দুপুর ১:০০ টায় ক্লাশ শেষ করে রুটিন মতো সিস্টারের কাছে গেলাম, ব্যথায় কাতরাচ্ছেন, আমার গলার শব্দ পেয়ে তিনি বললেন এসেছেন? দেখেন তো সিস্টারগণ সাধু লরেন্সের মতো আমাকে পোড়া দিয়ে মিশায় চলে গেছে, কখন মিশা শেষ হবে? আমাকে আগুন থেকে উঠাবেন? এই কথা শুনে খুব কান্না পেল আমি দৌড়ে দিয়ে নার্স সিস্টারদের ডেকে কথা বলার পর, উনারা ইনজেকশন দেওয়ার পর তিনি স্বস্থি পেলেন। আমার কান্না দেখে তিনি বললেন, কাঁদবেন না আমাকে সুন্দর মতো কবরস্থ করবেন। তিনি কষ্ট যন্ত্রণায় শুধু বলতেন "Jesus I love you, I praise you. I thank you Jesus, Jesus help me আরো অনেক প্রার্থনা, কোনদিন ঈশ্বরকে দোষারূপ করতেননা। ২৭ আগস্ট, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ। ক্লাশের আগে সিস্টারকে দেখতে গেলাম। অন্যদিনের মতো তেমন কষ্টের কথা নেই কেমন যেন চুপ হয়ে আছেন। দেখে অন্যরকম লাগলো। সব ডাক্তার নার্স, সিস্টারকে নিয়ে কিছু চিন্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি হাত ও কপাল স্পর্শ করলাম তিনি অবচেতনভাবে বলেন, দীপ্তি, কনসোলাটা - সিস্টারগণ বললেন উনারা আসতেছেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গেলাম স্কুলে। ক্লাশ শেষ করে এসে দেখলাম, কেউ সেলাই দিচ্ছে, কেউ রক্ত টানছে, কিন্তু তিনি নিশ্চুপ নিথর হয়ে পড়ে আছেন । সেলাই দেওয়া যাচ্ছে না, রক্ত নেওয়া যাচ্ছে না, এভাবেই ধীরে ধীরে মা জননী যিশুর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস নিলেন। এত প্রিয় কাছের মানুষ চোখের পলকে চোখ দুটো বন্ধ করে আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। চোখ বন্ধ করার সাথে সাথে তার আকাঙ্ক্ষিত সিস্টার দীপ্তি ও সিস্টার কনসোলাটা উপস্থিত হলেন কিন্তু মায়ের মুখের ডাক আর শুনতে পেলেন না। ঈশ্বর আমাদের এই মা জননীর চির শান্তি দান করুণ। আমাদের মনে স্মরণীয় হয়ে আছে ২৭ আগস্ট। আজ এক বছর হলো। তাই শ্রদ্ধায় এবং ভালোবাসায় তাঁকে প্রণাম জানাই। আমরা সবাই যেন সিস্টারের আদর্শ নিয়েই বাকী জীবনটা কাটাতে পারি॥

একজন আদর্শ নব্যা ও সংঘ পরিচালিকা

সিস্টার মেরী আশিস এসএমআরএ

সিস্টার মেরী তেরেজা এসএসআরএ তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পিপ্রাশৈর গ্রামের একটি শিক্ষিত ও আদর্শ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতা উভয়েই ছিলেন শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত। তাই তাদের সন্তানদেরও শিক্ষা, আদর্শে বড় করেছেন। সিস্টার মেরী তেরেজা ছিলেন তাঁদের পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান। তিনি পিতামাতা ও গুরুজনদের সহায়তায় নিজ আহ্বান আবিষ্কার করে তাতে স্থির থাকেন এবং ব্রতীয় জীবনে প্রবেশ করে ঈশ্বরের ইচ্ছা মতো চলতে শুরু করেন। সংঘের কর্তৃপক্ষগণ যখন লক্ষ্য করেন তাঁর বুদ্ধিমত্তা, আচার আচরণ তখন থেকেই তাঁর প্রতি বিশেষ নজর দেন এবং সংঘের জন্য ঈশ্বর যে পরিকল্পনা রেখেছেন তা আবিষ্কার করে তাঁর উপর বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করেন। আমি যখন নব্যালয়ে প্রবেশ করি তখন থেকেই তাঁর সাথে আমার পরিচয়। তাঁর ভালোবাসা আদর যত্ন আদর্শ সবই আমাকে আকর্ষণ করে। এমনি ভাবে চলতে থাকি তাঁর পরিচালনায়। নব্যা প্রার্থীদের নিয়ে তিনি একটি সুন্দর গঠনগৃহে আদর্শ পরিচালিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গঠনগৃহে সবার জন্য তাঁর ছিল বিশেষ দরদ। যারা মেধা ও বুদ্ধিগত দিক দিয়ে দুর্বল তাদের প্রতি তাঁর বিশেষ নজর ও আলাদা দায়িত্ব ছিল। নব্যালয় বা গঠনগৃহে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও গঠন দেয়াই পরিচালিকার দায়িত্ব। আদর্শ ব্রতধারিণী হতে যা প্রয়োজন তা তিনি ধাপে ধাপে শিক্ষা দিতেন এবং তা অনুশীলন করাতেন। যতক্ষণ তা সম্পন্ন না হতো ততক্ষণ তিনি তার জন্য সময় দিতেন এবং সাহায্য সহযোগিতা করতেন। তিনি যেন একজন আদর্শ ব্রতধারিণী হতে পারেন।

সিস্টার মেরী তেরেজার স্বপ্ন ছিল তিনি একজন সাধ্বী হবেন। তিনি তার নব্যাদের সবসময় ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার জীবন নিয়ে কথা বলতেন ও উদাহরণ দিতেন। ছোট ছোট কাজ ত্যাগস্বীকারের মধ্যদিয়ে কীভাবে সাধ্বী হওয়া যায় সবসময় নব্যাদের অনুপ্রাণিত করতেন ও উৎসাহ দিতেন। তিনি নব্যাদের সাথে কাজ করতেন যেমন, কাপড় কাচা থালাবাসন ধোঁয়া ইত্যাদি। আলাপের সময় শুধু আলাপই করতেন না সব সময় হাতে একটি কাজ নিয়ে বসতেন। শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করতেন। যেন আমরা শুদ্ধ বাংলা ভাষায় কথা বলা, ইংরেজীতে কথা বলা সম্বন্ধে শিখি। আমরা তা অনেক সময় পালন করতাম না তাই তিনি আলাপের সময় আমাদের কথাগুলো রেকর্ড করতেন। কিন্তু আমরা তা বুঝতেও পারতাম না, হঠাৎ যখন ছেড়ে দিতেন তখন হৈ-হুল্লা, হাসাহাসি ও আনন্দ করতাম। অন্যদিকে শিখতাম আমাদের কি করা দরকার। সংঘের বড় বড় পর্বগুলোর পূর্বে নাটক প্রাকটিস নাচগান করার জন্য উৎসাহিত করতেন। এতে অনেক আনন্দে সময় কাটাতাম। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী কিন্তু আনন্দ দিতেন ছোট ছোট কথার মধ্যদিয়ে।

সিস্টার মেরী তেরেজা ছিলেন আদর্শ গঠনদাতা। মিথ্যাকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দেননি। কেউ কখনো কোন অভিযোগ নিয়ে গেলে তিনি একপক্ষের কথা শুনে সমাধান দেননি, উভয়কে ডেকে সত্যটা যাচাই করতেন। ভুল করলে সঠিকটা শিখাতেন। তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী, যা সত্য তাই তিনি বলতেন। নিজের সংঘকে তিনি অনেক ভালোবাসতেন। তিনি যখন নব্যাদের পরিচালিকা এবং সংঘের পরিচালিকার দায়িত্ব পালন করেছেন সব সময় তাঁর চিন্তা চেতনা কীভাবে সংঘের সিস্টারগণ আধ্যাত্মিক ভাবে বেড়ে উঠবেন।

পারস্পরিক সম্পর্ক যেন সুন্দর হয় সে বিষয়ে সব সময়ই তিনি জোর দিতেন। প্রতিটি আশ্রমে যেন সিস্টারদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে, আশ্রমকে যেন শান্তিনীড়ে পরিণত করেন। সিস্টারগণ আশ্রমে যেন ভালোবাসায়, একতায়, আনন্দে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারে এমন চেষ্টা তিনি করেছেন। এমনকি মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তাঁর সেই একই বাণী সংঘের জন্য রেখে গেছেন। মৃত্যুর পূর্বের দিনগুলো তিনি রোগ যন্ত্রনা ও বার্ধক্যজনিত কারণে যে কষ্টভোগ করেছেন তার বেশির ভাগ সময়ই নীরবে সহ্য করেছেন। তাঁর মুখে শোনা গেছে যীশু, মা মারীয়ার কথা। ক্ষুদ্র প্রার্থনায় তিনি সময় কাটিয়েছেন। খ্রিস্টযজ্ঞ এবং খ্রিস্টপ্রসাদ ছিল তাঁর প্রধান খাদ্য। তাই প্রতিদিন তিনি খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি যখন বিছানায় পড়ে যান তখন তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাঁর ঘরে যেন খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয় এবং এতে যেন অনেক সিস্টার যোগদান করেন। সিস্টার সুপিরিয়র ব্যবস্থা করলেন এবং আমরা সবাই সেই খ্রিস্টযাগে যোগদান করে তার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করি।

মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব থেকেই তিনি সিস্টারদের ব্যক্তিগত ভাবে আশীর্বাদ দিতে শুরু করেছেন। আমরা মাদার হাউজে তুমিলিয়ায় যে সিস্টারগণ ছিলাম তাদের প্রত্যেককেই তিনি এভাবে আশীর্বাদ করেছেন এবং কাছাকাছি আশ্রমগুলো থেকেও অনেক সিস্টার এসে তাঁর আশীর্বাদ নিয়েছেন। মৃত্যুর দিন তিনি প্রার্থনা করেছেন শুধু যিশুকেই ডেকেছেন, যিশু তুমি এসো। দুপুরের পর থেকে তিনি যেন কেমন স্থির হয়ে গেলেন এবং এমনিভাবে তিনি আমাদের সবার সামনে থেকে পিতার কাছে চলে গেলেন। সিস্টার মেরী তেরেজা সত্যিই একজন ধার্মিক ব্রতধারিণী ছিলেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি॥

সেবাকারিণী মহিয়সী নারী সিস্টার মেরী তেরেজা

সিস্টার মেরী নির্মলা এসএমআরএ

যিশু বলেছেন, "মানব পুত্র তো সেবা পাবার জন্য আসেনি, এসেছেন সেবা করতে"

শ্রদ্ধেয়া সিস্টার তেরেজার জীবন আত্মসমর্পনের মাধ্যমে অন্যান্য বহুগুণের সাথে সেবাই-তাঁর মহান ব্রত ও ধর্ম হয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁকে দেখেছি নব্যালয়ে কাজ করার সময় থেকেই নিপুন হাতের সেবা দান করে মনের মাধুরী দিয়ে যিশুর জন্য ডালি সাজিয়েছেন মানসিক সেবা এবং অসুস্থতায় শারীরিক সেবা দান করে নব্যাদের সারিয়ে তুলেছেন। নব্যাগণ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে সুস্থ হয়ে আবার নতুন করে প্রভুতে আত্মদান করার শক্তি, আনন্দ, ভালোবাসা ও আশার আলো পেয়েছে এবং নিজেদের প্রভুর দ্রক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার জন্য তৈরী করে ব্রতের মাধ্যমে নিজেদের উৎসর্গ করেছে।

আশ্রমে সেবার কাজ পাওয়ার পরও দেখেছি সিস্টারদের একতার পথে চলার, একসাথে কাজ করার জন্য উদ্যোগী হয়ে মণ্ডলীর সেবা কাজে আত্মদান করে পুরোপুরিভাবে অংশগ্রহণ করার মনোভাব গড়ে তুলেছেন এর ফলে সিস্টারদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা, জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও সহভাগিতার মনোভাবও গড়ে ওঠেছে। সিস্টার সম্প্রদায়ের ভগিনীদের ভালোবাসা ও সুন্দর মন নিয়ে একযোগে কাজ করার প্রেরণা জাগিয়ে দিয়েছেন, ক্লাস নিয়ে পরামর্শ দিয়ে ও খেলাধূলার মাধ্যমে। "একসাথে যদি থাকা যায় ভাই, তার চেয়ে আনন্দ আর নাই"।

অসুস্থ বৃদ্ধ (শান্তিভবনে) সিস্টারদের সেবা দেওয়া ও দেখাশুনার দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি ছিলেন মায়ের মত। উনাদেরও আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক সেবা দিয়েছেন। আমি দেখেছি অনেক সময় গল্প গুজব খেলাধূলার মাধ্যমে আনন্দে মাতিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। বছরে দুই/একবার অন্যস্থানে ঘুরতে নিয়ে যেতেন। প্রার্থনা করতেন ও মনে সাহস দান করে প্রভুর কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করতেন। সিস্টারগণ শান্তিপূর্ণ ভাবে মৃত্যুবরণ করে পিতার ঐশরাজ্যে চলে গিয়েছেন। এভাবে তিনি অনেক সিস্টারকে পরম পিতার গৃহে পাঠিয়েছেন। তাঁর সেবা ছিল নিপুন। "আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি।" বর্তমানে তিনিও ঐশরাজ্যে পিতার কোলে অন্যান্য সিস্টারদের সাথে রয়েছেন। "সেবা কর দুঃখীজনে, সেবা কর আর্তজনে, সেই তো তোর খ্রিস্ট সেবা" সার্থক হয়েছে সিস্টারের জীবনে। সিস্টার সম্প্রদায়ে তাঁর সেবাকাজ সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করে ভগিনীদের কাছে আদর্শ রেখে গেছেন।

পরিশেষে বলতে পারি সেবা দিয়ে ও পরস্পরকে ভালোবাসার মাধ্যমে যিশুকে আমরা আপন করে নিয়ে জীবন পথে প্রতিদিন এগিয়ে চলতে পারি খ্রিস্টের নেতৃত্বে॥

যিশুর ভালোবাসায় জীবন সঁপেছি

সিস্টার মেরী বানী এসএমআরএ

"যিশুর ভালোবাসায় এসেছি, জীবন দিয়ে কাজ করেছি, মৃত্যুর কোন ভয় নেই" কথাগুলো বলেছেন শ্রদ্ধেয়া সিস্টার মেরী তেরেজা এসএমআরএ, মৃত্যুর ৩/৪ মাস আগে। জীবন শুরু ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ আগস্ট পিপ্রাশৈর গ্রামে। বাবা গাব্রিয়েল কোড়াইয়া মাতা মিটিল্ডা কোড়াইয়া। জ্যাঠা, জ্যাঠিমা, দ্বিতীয় সন্তান প্রথম মেয়ে। অতি আদর যত্নে, স্নেহ ভালোবাসায় লালিত পালিত। জ্যাঠা, জ্যাঠিমা, কাকা, কাকীমা, সহোদর চার ভাইবোন জ্যাঠাতো, কাকাতো ভাইবোনের মাঝে শিক্ষা দীক্ষায় বেড়ে উঠেন। বাড়ির সবার কাছে সম্মানের, শ্রদ্ধার, ভালোবাসার মেয়ে, দিদি, পিসি ও ঠাকুরমা।

সিস্টার এক বিশেষ ব্যক্তিত্বের মানুষ। বাড়ীর সবার কাছে তাঁর কথা, পরামর্শ, উপদেশ আদর শাসন গ্রহণীয় এবং পালন করতে তৎপর ও বাধ্য। ১৯৫২ খ্রিস্টবর্ষে খ্রিস্টের ভালোবাসার টানে শ্রদ্ধেয় মাদার আগ্নেশের সাথে যোগাযোগ রেখে বাড়ীর সবার অজান্তে চলে যান সেন্ট মেরীস কনভেন্টে। সবার ইচ্ছা ছিল তার আহ্বানের বিপরীত দিকে। তবুও কেউ বাঁধা দেয়নি বরং সাধুবাদ করেন। কোন অসুবিধা, বিশেষ ভাবে খাদ্যের ব্যাপারে জানতে চাইলে কোন অভিযোগ নেই বরং সবই তার কাছে ভাল বলে জানান।

আমি সিস্টারকে প্রথম দেখি শিশু শ্রেণীতে থাকাকালীন সময়ে এবং অনুপ্রাণিত হয়েছি অনুগৃহীত জীবনে। তখনকার সময় ১৯৫২-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সিস্টারদের নিজ বাড়ীতে যেতে দেখিনি। সাক্ষাতের দিন সময় নির্দিষ্ট ছিল। আমরা ছোট বড় সবাই সিস্টারকে দেখতে যেতাম কনভেন্টে। সিস্টার আমাদের প্রত্যেকের খোঁজ খবর নিতেন। উপদেশ ছিল- সত্য বলা ও সৎপথে চলা, পড়া করা, বাড়ীর কাজে সাহায্য করা, সবাইকে শ্রদ্ধা করা, খ্রিস্টযাগে যোগদান করা, সন্ধ্যায় রোজারী মালা প্রার্থনা করা। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে সিস্টারকে সংঘকর্ত্রী হিসাবে পাই। তখন আমি এ্যাসপাইরেন্ট। বোন হিসাবে কিছুতেই ছাড় নেই বরং আরো কঠোর ভাবে সংঘের নিয়মনীতি পালন করতে হতো। সিস্টারের উপদেশ, আদর, শাসন, যত্ন হতে বঞ্চিত হইনি। ত্যাগের পথে খ্রিস্টকে ভালোবেসে পারিবারিক সম্প্রীতিতে থেকে শান্তি আনন্দে বসবাস করা। সুন্দর এবং পবিত্র মনের ভাল মানুষ হওয়া।

সিস্টারকে ভয় পেলেও বেশির ভাগ সময় আমি একই আশ্রমে থেকেছি। একসময় সংঘকর্ত্রী হিসাবে আমি ভয় লজ্জা দূর করে অনুমতি নিয়েই চলেছি। পরবর্তীতে সিস্টার কোন কিছু করার আগে, আমার আগে অনুমতি নিয়েছেন। সরল ভাবে নম্র হয়ে স্পষ্ট ভাষায় সব কিছু বলতেন। অনেক ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিক অবস্থা বুঝে দরদমাখা অন্তরে সাহায্য করেছেন। পূর্বের ভয় লজ্জা ছিল না তিনি যেন আমার আধ্যাত্মিক পরিচালিকা, বন্ধু একজন। নিজেও নিয়ম পালনে আদর্শ ছিলেন, আমাকেও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তাঁর অনুরোধ ছিল পারিবারিক সম্প্রীতি বজায় রেখে চলা, সংঘের গোড়ায় ফিরে গিয়ে নতুন মন নিয়ে চলা। বড়দিনে যা সামান্য উপহার পেতেন তা বাড়ীর সবাইকে দিয়ে অনন্দ পেতেন। বাড়ীর ছোট শিশুরা নির্ভয়ে হাসি আনন্দে তাকে ঘিরে মনের কথা, ঘটনা বলতো।

সংঘের কর্ণধার হিসাবে ছিল বজ্রকণ্ঠ। প্রশংসা করতেন কিন্তু অন্যায়, অসত্যকে কড়া করে দেখতেন। অসুস্থ বয়স্কা ভগ্নির জন্য দরদের, যত্নের আন্তরিকতার শেষ নেই। ভুলে যেতেন নিজের খাবারের সময়ের কথা। কিসে ভাল হবে তা ছিল তাঁর ধ্যান, জ্ঞান ও বাস্তব পদক্ষেপ। সত্যবাদী স্পষ্টবাদী হওয়ায় আদর শাসন দু'দিকই ছিল। মৃত্যুর পূর্বে আমার সাথে শেষ কথা "আমি কোনদিন এক ভগ্নির কথা অন্য ভগ্নিকে বলি না বলবও না।" একথা আমি হৃদয় মনে গ্রহণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সমালোচনা করলেও সিস্টারের কথা আমাকে সতর্ক করে দেয়, বাঁধা দেয়। প্রশংসা করতে ও গুণ দেখতে অনুপ্রেরণা যোগায়। হে মহান সৃষ্টিকর্তা, আমিও যেন তাঁর মতো যিশুর ভালোবাসায় জীবন সঁপে দিতে পারি।

ও সিস্টার কথা আমাকে সতর্ক করে দেয় বাধা দেয় প্রশংসা করতে গুণ দেখতে অনুপ্রেরণা যোগান॥

কিছু কথা কিছু স্মৃতি

সিস্টার মেরী হিমা এসএমআরএ

'স্মৃতি' এক প্রকার তথ্য সংরক্ষণ করার ক্ষমতা যার দ্বারা মানুষ প্রতিনিয়ত নতুন নতুন তথ্য সংরক্ষণ করতে থাকে। 'স্মৃতি' এই ছোট দুটো অক্ষরের মধ্যে লুকিয়ে আছে হাজারো ফেলে আসা মুহূর্ত। স্মৃতি আছে বলেই বুঝি ভালোবাসা এখনো বেঁচে আছে। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে এমন কিছু অনুভূতিসম্পন্ন ও ভালোবাসা মাখানো স্মৃতি থাকে যা চিরকাল সজীব থাকে মানুষের মনের কোঠায়, কোন কাল, স্থান, গণ্ডি তা মুছে দিতে পারে না। কিছু কথা কিছু স্মৃতি যাকে ঘিরে তিনি হলেন সিস্টার মেরী তেরেজা এসএমআরএ (প্রাক্তন সুপিরিয়র জেনারেল)। সিস্টারের সাথে আমার খুব কাছে থেকে কাজ করার সুযোগ হয়নি তবে চলার পথে সংঘে যেভাবে জেনেছি, চিনেছি এবং দেখেছি স্বর্গীয়া সিস্টারকে। তিনি ছিলেন একজন অমায়িক, প্রার্থনাশীল ও আধ্যাত্মিক, নম্র-বিনয়ী, প্রশান্তিপূর্ণ, ভদ্র, হাসিখুশি, উদার, দয়ালু, কোমলমতি, কষ্টসহিষ্ণু, ধৈর্য্যশীল এবং ঈশ্বরনির্ভরশীল এক ব্যক্তি। আমি সিস্টারকে দেখেছি সংঘের নিয়ম পালনে তিনি ছিলেন খুবই বিশ্বস্ত। তিনি নিজে নিয়ম পালন করতেন এবং আমাদেরকেও বিশ্বস্তভাবে পালন করতে উৎসাহিত করতেন। দেখা হলেই হাসি মুখে কথা বলতেন বাবা-মা সবার কথা জানতে চাইতেন এবং আমাকে বলতেন যিশুর জন্য জীবন উৎসর্গ করেছ আর পিছন ফিরে তাকাবে না। এ জীবনে দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনা আছে থাকবে এগুলোকে নিয়ে সামনে এগোতে হবে।

আমি দেখেছি সিস্টারের মধ্যে একটা স্বর্গীয় আভা। কেন জানি মনে হতো তাঁর সান্নিধ্যে প্রশান্তি আছে, আছে অনেক সুখ। আমাকে সিস্টার খুব স্নেহ, যত্ন, আদর ও ভালোবাসতেন এবং বিভিন্ন কথোপকথনের মাধ্যমে বুঝতে পারতাম তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন। যিনি বিশ্বাসী মানুষ তিনি মানুষকে বিশ্বাস করেন। ব্রতীয় জীবনে এটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

তিনি যে একজন আধ্যাত্মিক, প্রার্থনাশীলা এবং কষ্টসহিষ্ণু, ধৈর্য্যশীল ও ঈশ্বরনির্ভরশীল তা আমি দেখেছি তাঁর অসুস্থতার সময়ে। তাঁর মৃত্যুর আগে কিছু সময় অসুস্থ হয়ে মেরী হাউজে ছিলেন। তখন খুব কাছে থেকে দেখেছি নীরবে নিজ যাতনা সহ্য করতে এবং যিশু নাম অনবরত মুখে উচ্চারণ করতে। যখন তিনি অনেক কষ্ট পাচ্ছিলেন তখন তিনি এ বলে আত্মসমর্পণ করেছেন, "প্রভু যিশু তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।" আসলে তিনি জীবনে যিশুকেই একমাত্র প্রথম ও প্রধান স্থান দিয়েছেন বলেই এবং অনুশীলন করেছেন বলেই মৃত্যু পর্যন্ত যিশু নাম উচ্চারণ করতে পেরেছেন। আমি প্রেরণা পেয়েছি যিশুর জন্য যখন সব কিছু ছেড়ে এসেছি তখন যিশুই তো আমার একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত।

আজ মনে পড়ে সিস্টারের উপদেশবাণী। দেখা হলেই তিনি আমাকে বলতেন হিমা যা কিছুই কর না কেন জীবনে বিশ্বস্ত ও খোলামেলা থাকবে দেখবে ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করবেন। সত্যিই আজ বাস্তবতায় নিজ জীবন দ্বারা দেখছি বিশ্বস্ততা আমাকে কতবার কতভাবে রক্ষা করেছে ও করছে। মেরী হাউজ থেকে সিস্টারকে মাদার হাউজে নিয়ে যাবার পর একদিন মাদার হাউজে তাঁর সাথে দেখা করে কথা বলেছি। আমি জানতাম না ওটাই সিস্টারের সাথে আমার শেষ কথা হবে। আমি সিস্টারকে বললাম আমার জন্য আপনার কী বাণী রেখে যাবেন। আমার হাত ধরে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, হিমা সংঘের অবস্থা বেশি ভালো নেই। আমরা অনেক হালকা হয়ে গেছি, জাগতিকতা নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের আরো বেশি প্রার্থনা করতে হবে সংঘের জন্য চিন্তা করতে হবে এবং সংঘবদ্ধ জীবন ও নিজ জীবনে বিশ্বস্ত থাকতে হবে। আমি যে সংঘে আছি সেটাকেই আমার প্রাধান্য দিতে হবে। সর্বপ্রথমে সংঘের মাধ্যমেই আমরা মণ্ডলীতে সেবাকাজ করছি। সেদিনের সিস্টারের এ কথাগুলো ফেলে দেওয়া যায় না আমার হৃদয়ে বাজে প্রতিনিয়ত ও আমার জন্য স্মৃতি হয়ে আছে। আমি সংঘকে ও নিজেকে মূল্যায়ন করে সিস্টারের কথাগুলোকে অন্তর গভীরে ধ্যান করার সুযোগ পেয়েছি। মহান ব্যক্তিই পারে ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলতে। তাই সংঘের বাস্তবতার সাথে ও সিস্টারের উপদেশ বাণী মিলিয়ে দেখে নিজ জীবনে অনুশীলন করার পদক্ষেপ নিতে পারছি।

আমার স্মৃতিগুলি আমার কাছে অনেক কিছু বলে এবং আমি সেগুলিকে আমার হৃদয়ের কাছে ধরে রাখি। স্মৃতি আমাদের জীবনে এমন কিছু মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে যারা আমাদের জীবনে অনেকটা স্থান আজও জুড়ে আছে যদিও বাস্তবতায় তিনি বর্তমানে নেই। কিছু স্মৃতি অবিস্মরণীয়, চিরকাল প্রাণবন্ত এবং হৃদয়গ্রাহী। ঠিক তেমনি সিস্টার মেরী তেরেজার কিছু কথা আমার জীবনে কিছু স্মৃতি হয়ে আছে, থাকবে। অনেক বড় কিছু না আবার অনেক বড় কিছু স্মৃতি আমার জীবনে। সর্বদা স্মরণে রেখে নিজ জীবনকে পরিচালিত করার সাধনা করে যাবার চেষ্টা আছে, করছি। আজ আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি শ্রদ্ধাভাজন সিস্টার মেরী তেরেজাকে তিনি আমার জীবনে অম্লান ও অমর স্মৃতি হয়ে থাকবেন। স্বর্গীয় পিতা সিস্টারের আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন॥

একজন আদর্শ ব্যক্তি সিস্টার মেরী তেরেজা

সিস্টার মেরী কল্যানী এসএমআরএ

সিস্টার মেরী তেরেজা ছিলেন একজন আদর্শ ব্যক্তি, শিক্ষিকা, নব্যা পরিচালিকা এবং আদর্শ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সংঘ পরিচালিকা। তিনি একজন মমতাময়ী আদর্শ নারী যিনি অন্যের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। নির্ভীক এক ব্যক্তি যিনি কঠিন সমস্যায় স্থির ও অটল থেকেছেন। এক উজ্জ্বল নক্ষত্র তিনি। বুদ্ধিদীপ্ত এক মানুষ গড়ার কারিগর তিনি। ধীর, স্থির শান্ত প্রকৃতির অথচ কঠোর পরিশ্রমী একজন আদর্শ ও ভালোবাসার মানুষ। তিনি পারতেন মানুষকে সঠিক পথের নিশানা দেখাতে। অভিজ্ঞ ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ হয়ে দৃঢ়তার সাথে নিজ দায়িত্ব পালনে ছিলেন স্থির চিত্ত। নিয়মপালনে ছিলেন বিশ্বস্ত অথচ তার মধ্যে ছিলোনা কোন পক্ষপাতিত্ব। তিনি আমাদেরকে তাঁর কঠিন শাসন অথচ সোহাগ ভরা মন নিয়ে আদর যত্নের মাধ্যমে আমাদের শিখিয়েছেন, উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে পথ চলতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর দরদমাখা ভালোবাসায় আমরা পথ চলেছি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের খোঁজখবর নিয়েছেন। দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যায় সাহায্য করেছেন। আমাদের কথা শুনে সার্বিক নির্দেশনা দিয়েছেন। ভুল করলে সংশোধনের মাধ্যমে সার্বিক বিষয় করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন।

সংঘের প্রতি ছিল তার অপরিসীম দরদ। তাই আমাদের গোড়ায় ফিরে গিয়ে ক্যারিজম অনুযায়ী জীবন যাপনে অনুপ্রাণিত করতেন। এক সাথে খ্রিস্টপ্রেমে বৃদ্ধি পেয়ে পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধন গভীর এবং শক্তিশালী করতে উৎসাহিত করতেন।

দরিদ্রদের ভালোবাসতেন খুব। তাদেরকে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে স্বনির্ভর করতে চেষ্টা করতেন অবিরত। এভাবেই তিনি মানুষের সেবা করেছেন অকৃপণভাবে। নিজে যেমন পরিশ্রমী ছিলেন তেমনি আমাদেরও উৎসাহিত করতেন। তার সেবা ছিল নিপুণ হাতের। আর সেবার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়েছেন শান্তিভবনে ভগিনীদের সেবাযত্নের মাধ্যমে। আজ সত্যিই সিস্টারকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি। তিনি মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত প্রভুতে নির্ভরশীল ছিলেন এবং সংঘের জন্য তাঁর প্রেরণার বাণী রেখে গেছেন। তিনি তাই আমাদের সবার জন্য আদর্শ ব্যক্তি, অনুকরণীয় ও শ্রদ্ধার এক মহামানবী॥

তোমার জীবন ধারা

সিস্টার মেরী নিবেদিতা এসএমআরএ

নিবেদন করে দিলে নিজেকে যিশুতে এবং মারীয়াতে। তোমাকে তো ছোট বেলা থেকেই জানি ও চিনি মামাতো বোন সন্ধ্যাদি হিসেবেই। ভালোবাসতে অনেক, খোঁজ খবরও নিতে। এই ছিল তোমার একটা বিরাট গুণ, কারণ সব শরীক বাড়ীর সাথে একাত্ম হওয়া। তুমি তো সব সময় আমাকে তুই বলেই ডাকতে। আমার শিক্ষকও ছিলে। মাদার আগ্নেস তোমাকে একান্তভাবে কাছে রেখে শিখিয়েছেন হিসাব নিকাশ, গোপনীয়তা রক্ষা, মানুষকে আদর সোহাগ দিয়ে কথা বলা উপদেশ নির্দেশ ইত্যাদি দিতে। দুষ্টামী করতাম বলে অনেক বকাও দিতে মৃদু ভাষায়। সম্প্রদায় জীবনে আসার জন্য তাগিদও দিয়েছ। মনে পড়ে ড্রইং পেনটিং করতে পারতাম, সেলাইও করতে জানতাম বলে কত কার্ড করতে দিয়েছ পুষ্প সংঘের জন্য। অংক কম পারতাম তাই আলাদা করে ডেকে বুঝিয়ে দিতে। কারো সমালোচনা করতে না। বলতে পচা মাছ বিক্রি করতে আমার কাছে নিয়ে আসবে না। নিয়ম প্রার্থনায় ব্রত জীবনের সৌন্দর্য রক্ষায় কত গভীর ছিল তোমার মন প্রাণ। তুমি সবাইকে ত্যাগী হতে শিখিয়েছ। তুমি তো সর্বদা বড় বড় দায়িত্ব ভার নিয়ে সম্প্রদায়কে দৃঢ় ভাবে সমস্ত সমস্যার সমাধান দিয়েছ। কোন বড় ভারী কাজ হলে বলতে আমার একটা কাজ আছে সবাইকে নিয়ে করতে পারবে? না জেনেই বলতাম হ্যাঁ পারবো। মাদার হাউজের দরজা, জানালায় বিল্ডিংয়ে রং করা থেকে শুরু করে সব ধরণের কাজ আমরা করতাম। কারণ তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের সাথে কাজে হাত লাগাতে। এতে আমরা আরো উৎসাহ পেতাম। টিফিনে ভাল খাবারও দিতে ।

মরণের আগ পর্যন্ত প্রার্থনা ও রোগী ভগ্নিদের সেবা করেছ নিজ হাতে। প্রস্তুত করেছ যিশুর কাছে যেতে। খুব মনে পড়ে ১২ বছর শিক্ষক থেকে আবার আমাকে নার্সিং এ পাঠালে কি মনে করে জানিনা। তবে প্রার্থনা করতে দিয়েছিলে মন স্থির করার জন্য চ্যাপিলে। কিছু তো মনে আসেনি শুধু বসেই ছিলাম। বোবা কান্নায় মনটা ভরেছিল। বিকেলে ডেকেছ, উত্তর দিলাম মনে কিছু আসেনি। তুমি যা করতে চাও আপত্তি নেই। পরদিন চলে গেলাম ফরম নিয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেলে পরীক্ষা দিতে। পরীক্ষা দিয়ে ১ম হয়ে গেলাম। যিশুর সাথে তখন রাগ করেছি কেন আমার প্রার্থনা শুনেননি। সাতবছর পর ফিরে এলাম। পাঁচমাস মাত্র মাদার হাউজের হাসপাতালে কাজ করলাম। আবার ডাক এলো, ঢাকা চলে আস, কাজ আছে, কারণ সরকারী চাকুরী করেছি আমরা দুজন। ঢাকা এলাম আবার বললে তুমি সিস্টার থিওডোরার মত একটু কাজ কর। আর্চবিশপ মাইকেল চেয়েছেন যেন একজন নার্স দেই যাতে ফাদার, ব্রাদার, সিস্টারগণ অসুস্থ হলে সেবা দিতে পারে। তাকে নিয়ে যেন সমস্যা

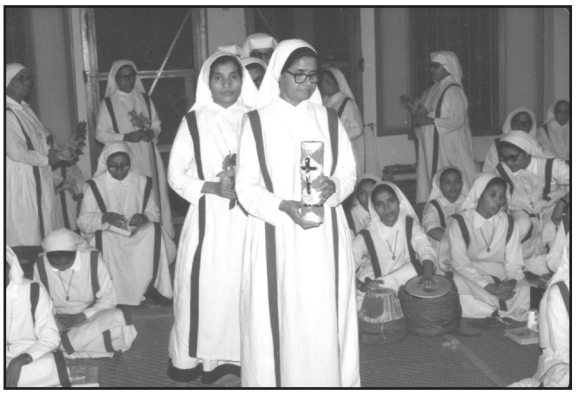

না হয়। বিভিন্ন হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ রেখে নার্সদের সৎপথে রাখা যায়। গেলাম শিশু হাসপাতালে। আমাদের ময়মনসিংহের মেট্রন রাগ করে বদলীর অর্ডার নিয়ে একই শিশু হাসপাতালে কাজ করছেন। আমাকে দেখার সাথে সাথেই বললেন আমার সাথে কাজ কর আজকে থেকেই। তিনি ডাইরেক্ট কাজে নিয়ে গেলেন। উনি একটি কাগজ বের করে দিয়ে বললেন আজই যোগদান করেন। আমি একটু সময় চেয়েছি। উনি দুদিন মাত্র দিলেন। এ সুযোগে মাদার হাউজে গিয়ে সকল কাজ সিস্টার কল্যানীকে বুঝিয়ে দিয়ে চলে আসি।

শুরু হলো শিশু হাসপাতালের যাত্রা প্রতিদিন তিনটা বাজলেই মেরী হাউজের গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে, কখন ফিরব। এলেই খাবারগুলো খুলে কিছুক্ষণ বসে কথা বলতে। আর যত রোগী সিস্টার বা কোন আত্মীয় বা সাধারণ মানুষ আসত তাদের বসিয়ে রাখতে। যদি খারাপ কিছু হতো ফোন করে আমার হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে। আমি আমার হাসপাতালে তাদের দেখে পরীক্ষা নিরীক্ষা ঐখান থেকেই করে দিতাম। বটমলী হোমের জন্যও একই ব্যবস্থা। যত কিছুই হোক বলতে একটু অপেক্ষা কর, নিবেদিতা এসে ব্যবস্থা করবে। এত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তোমার। কারো জন্য কোন কার্পন্য করোনি। প্রত্যেক রোগী সিস্টারদের রান্না কেমন হবে তা বলতে একটু খানি দেখিয়ে দিতে বলতে। যত অতিথি আসত রান্নার জন্য বলে রাখতে। কেউ আসার হলে বা সব বড় অনুষ্ঠানে আমি রান্না করবো এটা তোমার আবদার ছিলো। একটু পর দেখতে যেতে, কতদুর হলো ইত্যাদি।

সম্প্রদায়ের কত্রী, নব্যালয় পরিচালিকা হিসেবে সুন্দর ভাবে গঠন দিয়েছ আমাদের। তোমার ও সিস্টার মেরীলিনের অসুস্থতা দেখার দায় ভার আমার হাতেই ছিল। আগে শান্তিভবন তো মেরী হাউজেই ছিল। ডাক্তার ডেকে আনতাম ঘরে। আমি চেষ্টা করেছি নির্দেশ পালন করতে। সব কটা সেমিনারী, বিশপস্ হাউজ ও বাইরের রোগীদের সাহায্য করা ও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা। প্রতিটি কাজ তোমাদের সাথে কথা বলে সমাধান করেছি। তাই বলি তুমি সম্প্রদায়কে এত ভালোবাসতে তা সত্যি অসাধারণ। কাউকে কোন কটু কথা বলতে দেখিনি। ঈশ্বর তোমাকে সুন্দর দেহ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে সঙ্গে কোমল একটি হৃদয় দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সম্প্রদায়কে আকড়ে ধরে রেখেছ। নানা উচ্চ শিক্ষা দিতে বিভিন্ন জায়গায় ভগিনীদের পাঠাতে। জন সাধারণও তোমার কাছ থেকে অনেক পেয়েছে। পাটের কাজে তুমিলিয়া মহিলাদের দেখাশোনা করতে এবং সিস্টার লিলিয়ানকে সাহায্য করতে। আরো কত কি যে করেছ তা আমরা যারা পুরাতন তোমার আশ্রয়ে থেকেছি সবাই তা স্বীকার করতে বাধ্য। সিস্টার মণিকাকে তুমি সাহায্য করতে হিসার নিকাশে। সব শেষে বলতে চাই, দিদি তুমি ধন্য, ধন্য তোমার জীবন।

তোমার সামাজিক বোধ ছিল প্রচুর। দেশীয় কৃষ্টি ধরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা ছিল। তুমি গ্রামে বেশি যাওননি। কিন্তু প্রত্যেক সিস্টারদের আত্মীয় পরিজনকে চিনতে, খোঁজ খবর রাখতে। তাই মানুষ তোমাকে খুবই মনে করে এবং ভালোবাসে। সবার সঙ্গে আত্মার আত্মীয় হয়ে প্রার্থনাশীল জীবন কাটিয়ে গেছ। যাবার আগের উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের ডেকে দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছ। শেষ বার মেরী হাউজে যখন এলে তখন আমাকে বলেছ হাসপাতালে যাইনি কেন? আমি বলেছি কখন ওরা গেছে জানিনা। সকালে অফিসে যাব। তুমি বললে না যেতে। তাই যাইনি, ফোনে বলে দিলাম আজ আসতে পারবনা। সারাক্ষণ তোমার কাছেই ছিলাম।

একবার সিস্টার মিতালীর বাবা অসুস্থ হয়। খেতে চায় না, আমি দেখতে গেলে দাদা বলে পিয়ন বাড়ীর সন্ধ্যা কই আসেনা কেন? ফিরে এসে বলার সাথে সাথে তুমি চলে গেলে। আর নানা কথা বলে আদরে সোহাগ মিলিয়ে দাদাকে খাওয়াতে পেরেছ। বাড়ীর সবাই অবাক হয়ে গেল। আরো দেখেছি যে কোন পরিচিত কেউ মারা গেলে প্রত্যেকের অন্ত্যেষ্টি খ্রিস্টযাগে অংশ গ্রহণ ও কবর পর্যন্ত থেকে মাটি দিতে। দীন দরিদ্রদের প্রতি অনেক দয়া করতে। এত সুন্দর তোমার জীবন ছিল। তুমি তো আর কেউ নও, তুমি হলে সবার ভালোবাসার মানুষ সিস্টার মেরী তেরেজা। স্মৃতিতে আরো অনেক কথা আছে মনের গভীরে যা বলা যায় না। মনের কথা গুলো পরে শুনে নেবেন॥

শান্তি ভবনের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র

সিস্টার তন্দ্রা গ্লোরিয়া কস্তা পিমে

মাত্র একটি বছর আগেও যে নক্ষত্রটি আমাদের আকাশ অর্থাৎ শান্তিভবনে সরবে নীরবে জ্বলজ্বল করছিল তিনি আজ প্রদীপের আলো নিয়ে তার বর প্রিয়তম যিশুর সামনে দাঁড়িয়ে যেন বলছে, এই তো এসেছি আমি। সিস্টার মেরী তেরেজা (সন্ধ্যা মারীসেলিন কোড়াইয়া- বাড়ির নাম) আমার বড় মাসি যাকে আমি স্কুল জীবন থেকে দেখে আসছিলাম এসএমআরএ সম্প্রদায়ে প্রধান পরিচালিকা অর্থাৎ সিস্টার জেনারেল হিসাবে। মাসির সাথে যখন দেখা করে তার আশীর্বাদ নিতাম তিনি হাসিমুখে চুম্বন করে আশীর্বাদ দিতেন। আর তার পাশে যে সিস্টারগণ আমাকে চিনতেন না তারা প্রশ্ন করতেন "এটা কি সিস্টার জেনারেলের ভাগিনী? জুলির মেয়ে?" এভাবে সকলে সিস্টার জেনারেলের ভাগিনী বলে আমাকে স্নেহ, আদর ও ভালোবাসা দিয়েছেন। বোর্ডিংএ থাকাকালীন সময়ে আমার মা সব সময় দেখতে আসতে পারতেন না। আর এ অভাবগুলি পূরণ হতো এই দুই মাসির সান্নিধ্য পেয়ে। শুরুতে আমি সিস্টার দীপ্তিকে পেয়েছি আর সে সময় আমার মামাতো ভাই সুবীর যখন দেখতে আসতো সিস্টার দীপ্তি দুষ্টুমি করে বলতেন সুবীর দেখছি তন্দ্রার অভিভাবক হয়ে গেছে, আর খুব হাসতেন সবাই। আমার বড় মাসির অনেক গুণ ছিল। তিনি মানুষকে খুব সহজে আপন করতে পারতেন। তার মধ্যে ছিল এক মাতৃহৃদয় যেখানে আত্মীয় অনাত্মীয় কোন ভেদাভেদ ছিল না। সকলের প্রতি ছিল সর্বজনীন ভালোবাসা। আমার মার কাছে সিস্টার তেরেজার অনেক মজার মজার ঘটনা শুনেছি। কিভাবে তিনি এই আহ্বান পেয়েছেন, কোন পিছুটান তাঁকে আটকাতে পারেনি। যিশুর ভালোবাসা তাকে এমনভাবে আকর্ষিত করেছে যা তাকে সারাজীবন নিবেদিত জীবনে বিশ্বস্ত থাকতে সহায়তা করেছে। তিনি একাধারে একযুগ তার সম্প্রদায়ের পরিচালিকা হিসেবে বলিষ্ঠ নেতৃত্বদান করেছেন এবং শেষের দিকে শান্তিভবনের করুণাময়ী মা হিসাবে সকল বৃদ্ধা সিস্টারদের সেবা, যত্ন এবং সঙ্গদান করেছেন।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে তার একটি ভূমিকা তুলে ধরতে চাই। আমি তখন দশম শ্রেণীতে বোর্ডিং-এ পড়াশুনা করছিলাম। সিস্টার মেরী দীপ্তি বদলী হয়ে যান অন্যত্র। আমার লেখাপড়ায় ভাটা পড়ে। আমি মনে মনে স্থির করি আর পড়াশুনা করবো না। আর সেসময় আমার পায়েও সমস্যা হয় এবং অপারেশন করার পর এক বছর বাড়িতে থাকি। আমি ভাবছিলাম ঈশ্বর বোধহয় এভাবেই পড়াশুনার সমাপ্তি ঘটালেন। ভালই হলো বোর্ডিং-এ আর যাচ্ছি না। আমি ভাবি এক, আর ঈশ্বর করেন আরেক। আমার মা আমাকে বড় মাসির কাছে নিয়ে যান মেরী হাউজে। সে সময় বড় মাসি হাঁপানির সমস্যায় ভুগছিলেন। মাসি আমাকে এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বোর্ডিং-এ যেতে বলেন। আমি বললাম, আমি যাব না। মাসি আর আমি কাঁদতে লাগলাম। মাসি আমাকে বুঝালেন এবং বললেন "দেখো তুমি রাজি না হলে আমিও এখান থেকে ঘরে ফিরছি না"। আমি দেখলাম অসুস্থ শরীরে মাসি অপেক্ষা করছেন, আমি যেন রাজি হই। আমি মাসি আর ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করলাম। শেষে বুঝলাম এটাই আমার মঙ্গল এনে দিয়েছে। আমি মাসিদের জীবন দখে ব্রতীয় জীবনে এসেছি। আর দুই মাসিই সবসময় তাদের চিঠি ও শুভেচ্ছা কার্ড পাঠাতেন আলাদা করে। তাদের কার্ড পেয়ে আমার খুব ভালো লাগতো। মাসি আজ এক বছর হয়ে গেল তুমি স্বর্গে চলে গেলে। আমি কিন্তু তোমার স্মৃতি বিজড়িত দিন গুলোর কথা চিন্তা করি এবং নিজের জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করি। মাসির জীবন এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতই সবার অন্তরে জ্বলতে থাকুক।

পরিশেষে আমাদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন সবার পক্ষ থেকে এসএমআরএ সম্প্রদায়ের সকল সিস্টার বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধেয়া সিস্টার মিনতি ও সিস্টার দীপ্তিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনারাও জীবনে মাসীর মত জ্বলতে থাকুন॥

মাতাজী

সিস্টার মেরী সুনীতি এসএমআরএ

মাতাজী অর্থ মা। আমরা শ্রদ্ধেয়া সিস্টার মেরী তেরেজার নব্যাগণ তাকে বেশির ভাগ সময় নিজেদের মধ্যে মাতাজী বলেই ডাকতাম। (প্রয়াত সিস্টার রোজ) সুন্দর করে বলতেন আমাদের মাতাজী। উনার মুখে কথাটা খুবই মানাতো। আবার (প্রয়াত সিস্টার রত্না সব সময় বলতেন আম্মাজান) আমি যখন নভিশিয়েটে ঢুকি উনি ছিলেন আমার নব্যামাতা। যুবতী কালে উনি ছিলেন যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী। উনি অনেক গুণে গুনান্বিত ছিলেন। উনার গুণের কথা বলে শেষ করা যাবে না। কয়েকটি গুণের কথা আমি উল্লেখ করতে চাই। উনি খুবই পরিপাটি ছিলেন। তিনি হাতের কাজ, আর্ট, সেলাই এবং এমব্রয়ডারী দিয়ে নিজে নিজে আবিষ্কার করে অনেক কিছু তৈরী করতেন। একবার উনি আমাদের নিয়ে কালো কাপড়ে সাদা তুলা দিয়ে কুমারী মারীয়ার ও তার জ্ঞাতি বোন এলিজাবেথের ছবিটি খুব সুন্দর করে আর্ট করেছিলেন। এত চমৎকার সেই ছবিটি যা বর্ণনা করা যায় না।

মাতৃস্নেহ উনার মধ্যে আমি ব্যক্তিগত ভাবে খুবই উপলব্ধি করেছি। বাড়ীতে আমি ভাই বোনদের মধ্যে ছিলাম ছোট। আর আমরা ছিলাম ছয় জন। এদের মধ্যে আমি নম্বরে ছোট। অনেক আদর পেয়েছি। তবে নবিশিয়েটে খুব ভালো কেটেছে। এত সুখে থাকলেও বাড়ীর কথা বিশেষ ভাবে বাবার কথা অনেক মনে পড়তো কারণ বাবা ছিলেন বৃদ্ধ, অসুস্থ। অনেক সময় কাজ কর্ম নিয়ম কানুন বেশি ভাল লাগতোনা কান্নাকাটি করতাম। বলতাম আমি বাড়ী চলে যাবো। সিস্টার লিউনী ছিলেন বড়। উনি আমাকে বললেন তুমি যাও সিস্টারকে বল আমার ভাল লাগেনা। আমি ভয়ে ভয়ে উনার ঘরে গেলাম সাক্ষাৎ করতে। উনার হাসিমুখ দেখে সবই ভুলে গেলাম। আমাকে বসালেন একটা মোড়ার মধ্যে। তারপর আমার সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলেন আমিও সব কিছু খুলে বললাম। উনি আমাকে এত সুন্দর করে ব্রতীয় জীবন বুঝালেন এতে আমার মন অন্যরকম হয়ে গেল। এরপর আমার যতই দুঃখ কষ্ট এসেছে কখনও বাড়ীতে চলে যাব বলি নাই।

ব্রত করে নভিশিয়েট থেকে বের হলাম। বেশির ভাগ সময়ই আমি দূরদূরান্তে ছিলাম। এত কাছে উনাকে আমি পাই নাই। তবুও যখন ঢাকায় আসতাম উনার সাথে আলাপ করতাম। সিস্টার অর্পিতার মৃত্যুর পর একটু সুযোগ নিয়ে উথুলী থেকে তুমিলিয়ায় যাই উনার কবরে। প্রার্থনা করার জন্য। আর মাতাজীকেও দেখব এ আশায়। উনার ঘরে গেলাম দেখা করার জন্য। এত সুন্দর করে হাসি দিয়ে বললেন কেমন আছেন। ভাল আছি সিস্টার। সিস্টার অর্পিতার কথা বলতেই উনার চোখে জল। উনি আমাকে একটা মোড়া এগিয়ে দিলেন বসলাম নীরবে। আমিই প্রথমে শুরু করলাম সিস্টার আমি আজ এই মুহূর্তে যে জায়গায় বসলাম নভিশিয়েটে ঠিক একই জায়গায় আমি হাঁটু দিয়ে দোষ স্বীকার করেছি। আপনার কাছে কত কষ্ট করে বলেছিলাম। সিস্টার অর্পিতা কার্ড করতে ছিলেন আর আমি ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলাম ঐ তোর কার্ডগুলো আমি জল

ঢেলে দেই? অমনি পিরিচের জল যে কিভাবে পড়ে গিয়ে কয়েকটি কার্ড নষ্ট হয়ে গেল। সিস্টার অর্পিতা বললেন দেখ মজা দেখ! কি আর করবো মাতাজীর কাছে ক্ষমা চাইলাম, শাস্তি নিলাম। মাতাজী বললেন, এত কথা আপনার মনে আছে আমার কিন্তু মনে নেই। তারপর অনেক কথা বলার পর আমি বললাম এখন এত কাজ করে? উনি আমার সঙ্গে মুখে কথা বলছেন আর হাতে কাজ কচ্ছেন ওল দিয়ে টুপি তৈরী করছেন। আমাকেও অনেকগুলো টুপী দিলেন বললেন, অপনার ওখানে ছেলেমেয়েদের দিবেন। এখন বেশি কিছু করতে পারিনা প্রার্থনা করি আর এগুলি করি ঘরে বসে বসে। এই শেষ কথা উনার সঙ্গে সুস্থাবস্থায়। উনি সব সময় হাতের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কোন মানুষের সমালোচনা করতে শুনি নাই।

জুন মাসের শেষ দিকে উনার অসুস্থতার কথা শুনেছি। উনার মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙ্গে গেছে। মেরী হাউজে নিয়ে আসা হয়েছে। ব্যথায় নাকি অস্থির তাই মনে করেছি দেখতে যাব। পরে উনাকে মাতৃগৃহে নেওয়া হয়েছে। আর আমিও নানা অসুস্থতার জন্য আর যেতে পারি নাই। শুধু প্রার্থনা করেছি আমি যেন মাতাজীকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাই আর কথা বলতে পারি। আমি প্রায়ই সিস্টার পুষ্পর কাছ থেকে খবরাখবর নিতাম। আগস্ট মাসের ২৬ তারিখে সিস্টার জেনারেলের পর্বের কথা শুনলাম। আমি তখন এই দিনটি হাতছাড়া করি নাই। সুযোগ নিলাম, যতই বাঁধা বা অসুবিধা থাকুকনা কেন আমি যাবই, আর হলোও তাই। গেলাম মাতৃগৃহ প্রথম ঢুকলাম মাতাজীর ঘরে। গিয়ে দেখি সিস্টারের সমস্ত শরীর কাঁপছে। কাউকে না দেখে সিস্টার সারাকে জিজ্ঞেস করলাম এরূপ করছেন কেন? উনি বললেন ব্যথায়। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে চোখে জল নিয়ে বললাম সিস্টার আমাকে চেনেন? উনি উত্তর দিলেন চিনব না কেন সুনীতি। আবার চোখ বন্ধ, শুধু কাঁপছেন। আবার কতক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করি সিস্টার ব্যাথা করে? উনি মাথা নাড়লেন। আবারও চুপ করে উনার কাছে নীরবে বসে থাকি। কি বলব কি জিজ্ঞেস করব ইত্যাদি। শেষে আর কতক্ষণ নীরবে একা একা বসে থাকব। বললাম সিস্টার আমি যাই মিসা হবে। আপনার জন্য প্রার্থনা করব। বললেন ফাদার গাব্রিয়েল এসেছেন? আমি বললাম আমি তো জানিনা সিস্টার উনার আসার কথা কিনা। তারপর আবার বললেন আমার কাপড়ে অনেক পিন আছে খুলে দেন। খুঁজলাম কোথায়ও পিন দেখি নাই। আবার বললেন যাবার আগে আমার জিনিস পত্র ঠিক জায়গায় রেখে যান। আঃ ! কি মুশকিল কোথায় উনার জিনিস কিছুই তো দেখিনা। নিজে নিজেই বললাম এখন উনার মাথায় কোন কাজ করে না। সারা মিসায় চিন্তা করলাম কি দেখলাম কি মানুষ কি হয়েছে। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই যে শেষ মুহূর্তে উনার সঙ্গে আমার একটু হলেও কথা হয়েছে এই আমার সান্ত্বনা।

খাওয়া দাওয়া অনুষ্ঠান শেষ করে চলে গেলাম বাড়ীতে। শনিবার দিন ২টা আড়াইটার দিকে ভাত খেতে বসলাম। মোবাইল বেজে উঠল, চশমা না থাকায় নামটা দেখতে পাইনি। মোবাইলে বললেন গতকাল না মা, মা করছেন মা স্বর্গে চলে গেছেন। আঃ ! কি বলেন, বিশ্বাস হয় না। আবার সিস্টার পুষ্পকে ফোন দিলাম উনি বললেন, হ্যাঁ। তাড়াহুড়া করে ভাত রেখেই চলে গেলাম মাতৃগৃহে। আর কি করা চ্যাপিলে প্রার্থনা করলাম উনার কাছে বসে। পরের দিন আবার উথুলি চলে আসতে হবে। শেষ পর্যন্ত মাটি দিতে পারি নাই। সিস্টার পুষ্প ও সিস্টার নির্মলাকে বলে আসলাম আপনারা আমার হয়ে একমুঠো মাটি দিবেন মাতাজীর কবরে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই এই কষ্ট থেকে উনাকে তার কাছে নিয়ে নিয়েছেন বলে। আর আমরা প্রার্থনা করবো স্বর্গ থেকে উনি যেন আমাদের সংঘের জন্য প্রার্থনা করেন। উনি আমাদের সংঘের জন্য অনেক কাজ করে গিয়েছেন অনেক অবদান রেখেছেন। উনার আত্মার চির শান্তি কামনা করি॥

আমার মা তেরেজা

সিস্টার মেরী প্রতিভা এসএমআরএ

দড়ির মত লম্বা আমার দড়িপাড়া গ্রাম। এই গ্রাম থেকে প্রতিদিন সকালে মিশায় যেতে হতো মীসা থেকে এসে স্কুলে যেতাম। বিকালে আবার ক্রুশের পথ। যারা বাড়ী আসতে না চাইত তাদের সিস্টারগণ পাউডার দুধ ও সীম বিচি খেতে দিত। অনেক সময় খুব কষ্ট হতো। তাই সিস্টার তেরেজা সিস্টারদের বলতেন মালতী ও তার সঙ্গীদের বেশি করে দুধ ও সীম বিচি দিবেন ওদের বাড়ী অনেক দূরে। এভাবে ৫ম শ্রেণী পাশ করে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উঠলাম। আমি খুবই প্রার্থনাশীল ছিলাম। সিস্টার সর্বদা আমাদের অংক ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান নিতেন। খুবই যত্নের সহিত পড়াতেন। কোন দিনও বকা দিতেন না। আমি তার কাছে খোলামেলা সব বলতাম। খুবই ভালোবাসা পেতাম। যখন ম্যাট্রিক দেই তখন আমি খুবই খুশি আমি সিস্টার হবো। সিস্টার তেরেজার সাথে থাকতে পারব। ম্যাট্রিক দেবার পর ছেলেদের স্কুলে দু'টা পোষ্ট খালি হয়ে যায়। মাদার জিজ্ঞেস করেছেন তুমি কি সিস্টার হবে? তোমাকে যদি সহকারী টিচারের পোস্ট দেই তুমি খুশী হবে? এক বাক্যে হ্যাঁ বলেছি। আমার বাবার মত ছিলনা, আমার কিন্তু খুবই ইচ্ছা। সিস্টার তেরেজা শুনে খুবই খুশী। একটা বৎসর সিস্টার মনিকার সাথে ছেলেদের স্কুলে পড়ালাম। তারপর নভিশিয়েটে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। সিস্টার তেরেজা বাবাকে খুব কষ্টে রাজী করালেন। আমরা গ্রুপে ছিলাম আটজন। আমাদের জিজ্ঞেস করা হলো আমরা কি খেতে চাই? আমি বললাম পাঁচ রকমের পিঠা খাব। সিস্টার তেরেজা হলেন আমাদের প্রার্থী মিসট্রেস্। উনি স্কুলের শেষে আমাদের দেখাশুনা করতেন। হাত ধরে আমাদের শিখাতেন। দিন যায় ভালই। একবার ঠাণ্ডা লেগে যায়। নভিশিয়েটে থাকতে কানের অবস্থা খুবই খারাপ হয়। সিস্টার তেরেজা ও সিস্টার মেরীলিন কোন কাজই আমাকে করতে দেন নাই। শুধু বসে সেলাই করতাম। তারা দু'জন আমাকে খুবই যত্ন করতেন ডাক্তার বলেছেন স্কুল পড়ালে কানের অবস্থা ভাল থাকবেনা। নভিশিয়েট হতে বার হবার পর তারা আমাকে বিভিন্ন ট্রেনিং দিয়ে সিস্টার লিলিয়ানের সঙ্গে পাটের কাজ করতে দেন। যদিও আমি স্কুল পড়াতে ভালোবাসতাম তাঁদের সুন্দর পবিত্র মুখের কথায় আমি রাজি হয়ে গেলাম।

সিস্টার তেরেজা হলেন সংঘকর্ত্রী। আমি তাদের বলতাম আর তো আমাকে বেশি দেখাশুনা করতেন না। সিস্টার বলেন সাগরের জল কোনদিন শুকায় না। আমার জীবনে দু'টি দুঃখপূর্ণ চ্যালেঞ্জের সম্মূখীন হতে হয়েছিল। আমার নামে কেউ লিখেছে যে আমি হিসাব ভুল করি আমাকে যেন জাগরণীতে আর না দেওয়া হয়। সিস্টার তেরেজা খুবই দুঃখ পান এবং তিনি বলেন সিস্টার প্রতিভা আমার ছাত্রী আমি ওকে ভাল চিনি। আমি এ বিষয় তদন্ত করবই। উনি অফিসে তদন্ত করলে ভুল পেলেন না। তাই তিনি আবার আমাকেই জাগরণীতে পাঠালেন। আর একবার বটমলীতে আমি নতুন বদলী হই। গিয়েই আমাকে পাঁচ বৎসরের অডিট করতে হবে। অডিটর আসেন। তিনি খুবই দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলেন। মাদারকে বিপদে ফেলার জন্য সাদা কাগজে নতুন সই নেন। আর বলেন পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দিলে অডিটর সব ঠিক করে দিবেন নতুবা মাদারকে জেলে যেতে হবে। খুবই দুষ্ট ছিলেন বলে খারাপ রিপোর্ট দেন। আমি জোরে জোরে কেঁদেছি। সিস্টার তেরেজা এসে যখন শুনে তখন উনি বলেন আমি আবার অডিট করাবো। বড় অডিটর দিয়ে অডিট করে কোন কিছু পাননি। তাই সিস্টার তেরেজা সত্যিই আমার মা। আমি উনাকে পেয়ে মাকে ভুলে থেকেছি। সব দুঃখ কষ্ট উনাকেই বলতাম। সিস্টার আমাকে বলতেন আপনার ভালোবাসা সর্বজনীন। কারও প্রতি বিশেষ আকর্ষণ নেই। মা তুমি স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ কর আমি যেন সর্বজনীন ভালেবাসা নিয়ে স্বর্গে যেতে পারি॥

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম

লাকী কোড়াইয়া

সন্ধ্যা মারীসেলিন কোড়াইয়া, আমাদের বড় পিসি। বাড়ি ছেড়ে এসএমআরএ সম্প্রদায়ের ভগিনী হিসেবে যোগদান করেন আমার জন্মেরও বহু আগে। নভিশিয়েটে থেকে সিস্টার, সম্প্রদায়ের নিয়ম অনুযায়ী নাম বদলে বড় পিসির নাম হলো সিস্টার মেরী তেরেজা এসএমআরএ। নীল-সাদা পোশাকে পিসিকে যখন প্রথম দেখি, তখন আমি অনেক ছোট। পিসির সাথে প্রথম দেখার যে দৃশ্যটা মনে পরে তা হলো- পিসি বাড়ি এলেন, মা আমাকে নিয়ে গেলেন পিসির কাছে। ঠাকুমা বললেন- তোর বড় পিসি। তখন হয়তো ভয়ে- লজ্জায় মায়ের শাড়ির আঁচলে লুকিয়ে ছিলাম। এর পর ধীরে ধীরে পিসির সাথে একটা ভাব হয়ে যায়। আজ পিসির সম্পর্কে লিখতে গিয়ে অনেক কথাই মনে পড়ছে। আমার খুব মনে আছে যখন পিসির ছুটি হতো- তখন আমাদের বাড়ী থেকে ছোট খাটো বাহিনী পিসিকে নিয়ে আসতে যেতাম। আমাদের আরেক পিসি সিস্টার মেরী প্রফুল্ল এসএমআরএ, তিনিও কখনো কখনো বড় পিসির সাথে ছুটিতে আসতেন। আমরা পিসিদের আনতে সিস্টার বাড়ীতে যেতাম আর খুব আনন্দ করেই নিয়ে আসতাম। কিন্তু অনেক সময় পিসিদের ছোট ব্যাগটা নিয়ে কেমন কাড়াকাড়ি করতাম, কে বহন করবে পিসিদের ব্যাগ। তখন বড় পিসি ভাগ করে দিতেন কে কতদূর ব্যাগ বহন করবে। পিসি বাড়ি এলে আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতাম পিসি কখন ব্যাগ খুলবে। আর সত্যিই পিসি ব্যাগ খুলে আমাদের হাতে তুলে দিতেন টক টক ঝাল লজেন্স! আহা! কী পরম তৃপ্তিতে আমরা তা গ্রহণ করতাম আর আমেন বলে মুখে পুড়ে দিতাম। সন্ধ্যা হলেই পিসি সবাইকে ডাকতেন প্রার্থনা করতে। বাবা-জ্যাঠা-কাকা কেউ বাদ পড়তেন না সেই ডাক থেকে। আমার যতদূর মনে পড়ে, আমাদের ছোটদের চেয়ে বাবা-জ্যাঠারাই যেন আগে প্রার্থনায় বসে যেতেন। কেননা বড় পিসিকে তারা খুবই সম্মান করতেন আর দারুণ ভয় পেতেন। তাহলে বাবা-জ্যাঠারা যখন ভয় পেতেন, তখন আমাদের ছোটদের অবস্থা তার চেয়ে ভালো কখনোই ছিল না। আমরা পিসিকে কম দেখতাম বলেই ভয় পেতাম। তবে প্রার্থনার ব্যাপারে ডাকার সাথে সাথেই চলে আসতাম। এর কারণ পিসি আমাদের সুন্দর গল্প শুনাতেন। তাঁদের ছোট বেলার কথা বলতেন। পিসি কীভাবে বড় হয়েছেন, পড়াশুনা করেছেন, সেই গল্প শুনাতেন আর আমাদের ভালো ভাবে পড়ার উপদেশ দিতেন। সন্ধ্যাবেলা খোলা আকাশের নিচে উঠানে বসে পিসির মুখে সেইদিনের গল্প শুনতে বেশ ভালো লাগতো। কখনো পিসি খুব করে হাসতেন ছোটবেলার কোন ঘটনা বলে। পিসি সাধারণত বেশি কথা বলতেন না। কিন্তু গল্পের সময় যখন হাসতেন, তখন আর পিসিকে ভয় পেতাম না। একটি বিষয় এখানে না বললেই নয়- আমাদের বাড়ি থেকে চার জন পিসি আর একজন দিদি এসএমআরএ সম্প্রদায়ে যোগদান করেছেন। কখনো দেখা যেত, তারা প্রায় সবাই এক সময়েই অল্প সময়ের জন্য বাড়ী এসেছেন। তখনও আমরা তাদের আনতে যেতাম। রাস্তা দিয়ে সবাইকে নিয়ে যখন একসাথে বাড়ী আসতাম, তখন অনেক লোক তাকিয়ে থাকতো। আমার খুব ভালো লাগতো তখন। পিসিকে যখন বলতাম, পিসি দেখো সবাই তোমাদের কীভাবে দেখছে! পিসি একটু হেসে বলতেন, তোরাও সিস্টার হবি, তখন তোদেরকেও এইভাবে দেখবে। নিয়মের ব্যাপারে বড় পিসি খুবই কঠোর ছিলেন। সেই সময় সম্ভবত বাড়ি আসার তেমন একটা নিয়ম ছিল না। আর এলেও যথাসময়ে চলে যেতে হতো। সম্প্রদায়ের বেঁধে দেওয়া নিয়মের বাইরে কখনোই যাননি পিসি। বাড়ি এসে তেমন কিছুই খেতেন না। কিছু খেতে দিলে পিসি বলতেন, খেতে আসিনি। তোদের দেখতে এসেছি। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বাড়ি থেকে চলে যেতেন। বাড়ি থেকে দূরে থেকেছেন ঠিকই, কিন্তু সব সময়ই বাড়ির খোঁজ রেখেছেন। বাবা-জ্যাঠাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতেন। তারা কিছু ভুল করলে বকা দিতেন এবং সংশোধনের কথা বলতেন। বাড়ি আসলেই বাবা-জ্যাঠা ও কাকাদের বলতেন- শোন, আমাদের বাড়ির একটা সুনাম আছে। বাড়ির সুনাম যেন নষ্ট না হয়। তাছাড়া আমরা পাঁচ বোন, এক ভাতিজি সিস্টার হয়েছি। সেই কথা মাথায় রাখবি। আর তরল পানীয় পানের ব্যাপারে পিসি খুবই কড়াভাবে শাসন করতেন বাবা- জ্যাঠা ও কাকাদের। তিনি সব সময় আমাদের পড়াশুনার ব্যাপারে খোঁজখবর রাখতে বলতেন। পিসি যখনই বাড়ি আসতেন, বলতেন বাড়িতে যেন সন্ধ্যার প্রার্থনা কখনো বাদ না যায় এবং সেই সাথে বাড়ীর সকলকে মিলেমিশে থাকতে বলতেন। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে পিসি অসুস্থ হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে ডেলফিনা পিসিকে নিয়ে বড় পিসিকে দেখতে গেলাম। পিসি তখন কথা বলতে পারেন না তেমন। পিসির চেহারার মধ্যে অনেক শান্ত একটা ভাব লক্ষ্য করলাম। অনেকটা শিশুদের মত লাগছিল পিসিকে। বিছানায় শুয়ে, নড়তে পারেন না। খুব মৃদুস্বরে একজন সিস্টারকে ডাকতে বললেন, যিনি পিসির সেবাযত্নে নিয়োজিত ছিলেন। হালকা কথা হলো পিসির সাথে। লক্ষ্য করলাম পিসির চোখ দু'টো অনেকটা ভিজে আসছে। পিসি অনেক শক্ত মনের ছিলেন। কিন্তু অসুস্থতায় পিসির মনের গহীনে কি চলছিল বুঝতে পেরেছিলাম। একটা চাপা কষ্ট মনে চেঁপে সেদিন ফিরে এসেছিলাম। পিসিকে দেখে আসার ৫/৬ দিন পর পিসির চির বিদায়ের খবর পেলাম। পিসির চলে যাওয়াটা মেনে নেওয়া খুব কষ্টের ছিল। পিসি আমাদের সকলের আদর্শ ছিলেন। আজ পিসির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মনে হচ্ছে, পিসির সম্পর্কে বলার অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু লিখতে পারিনি। আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস ও উৎসাহদাতা, আমাদের বড় পিসি সর্বদা আমাদের মনের গভীরে বিরাজ করবেন। আমি বিশ্বাস করি, প্রেমময় পিতা ঈশ্বর তাঁর সেবিকা আমাদের বড় পিসি সিস্টার মেরী তেরেজা এসএমআরএ কে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের ত্যাগ সেবা কাজের পুরস্কার স্বরূপ তাঁর অনন্তধামে স্থান দিয়েছেন। পিসির অসুস্থতায় সম্প্রদায়ের সকল ভগিনীগণ পিসির সেবা করেছেন এবং মানসিক শক্তি যুগিয়েছেন। প্রার্থনা করি ঈশ্বর তাদের সকলের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য দান করুন।

সহযোগিতায়:
সিস্টারস সংগীতা, তপতী, আরতি, নমিতা, ইনেস, দেবাশিস, লিওবা, চামেলী, বাণী, ক্লারা ও দীপ্তি।

স্বপ্নময় জীবন

দিপ্ত পিউ পিরিচ

মানুষের জীবন নদীর স্রোতের মত গতিময়। আর এই গতিময় জীবনে মানুষ ছুটে চলে তার ঠিকানার সন্ধানে। অর্থাৎ কেউ কেউ ছোটবেলা থেকে স্বপ্নদেখা শুরু করে বা স্বপ্নের বীজ বপন করে দেখে যে, সে ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হবে। আবার কেউ কেউ স্বপ্ন দেখে বিল গেটসের মত ধনী হবে। আর এ সকল প্রত্যক্ষ করে মণীষী ক্লিন্টন বলেন, "প্রত্যেকটি মানুষই স্বপ্নের রাজা।" আসলে মানুষের জীবনে স্বপ্ন কী? এ বিষয়ে এপিজে আব্দুল কালাম বলেন যে, যে স্বপ্ন মানুষকে ঘুমাতে দেয় না সেটাই আসল স্বপ্ন এবং যে তার কথামত সেই পথ অনুসরণ করে সেই আসল স্বপ্নবাজ। স্বপ্ন দেখা যেমন সকলের অধিকার রয়েছে তেমনি সেই স্বপ্ন পূরণেরও সকলের সক্ষমতা আছে। অনেক সময় মানুষ তার স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হয়। কারণ সে কথায় বিশ্বাসী কিন্তু কর্মে শূন্য। মানুষ ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে যে সে প্রজাপতির মত আকাশে উড়ছে। কিন্তু বাস্তবে কল্পনার জগৎ বলে কিছু নেই। কিন্তু মানুষের রয়েছে সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার সামর্থ্য। এরকমই একটি ছেলের স্বপ্ন পূরণের গল্প উল্লেখ করা হল।

একবার এক গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে ৪ ভাই ছিল। চার ভাইয়ের মধ্যে ২য় ভাই জ্যাক ছিল একটু ব্যতিক্রম স্বভাবের। সে ছিল খুব ভাল মেধাবী, বুদ্ধিমান ও সহজ-সরল প্রকৃতির। সে ছোটবেলা থেকেই তার পিতামাতার বাধ্য ছিল এবং পড়াশুনার প্রতি তার ছিল বেশ আগ্রহ। বরাবরই সে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করত। তার ছিল শেখার ও জানার প্রবল আগ্রহ। সে সবসময় গ্রামের মানুষদের কল্যাণের কথা চিন্তা করত। সে জন্য গ্রামের সবাই তাকে ভালোবাসত ও স্নেহ করত। সেই সাথে সে নিজেও স্বপ্নের বীজ রোপণ করেছিল, জীবনে বড় কিছু হওয়ার ও করার। এর জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করত ভালোমত পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে। সে পড়াশুনার পাশাপাশি গ্রামের বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিল ও সংগঠন পরিচালনা করত গ্রামের যুবকদের নিয়ে। তার এ কর্মের জন্য তার পিতামাতা এবং গ্রামের মানুষরা অনেক সমর্থণ করতো। যখন সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তখন থেকেই লক্ষ্য স্থির করে রাখে সে বিসিএস ক্যাডার হবে। অনেক সময় দারিদ্রতার কারণে অনেক প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হয়েছে। তবুও সে থেমে যায়নি বরং নিজ কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। আর এর জন্য তাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। অর্থাৎ স্বপ্ন পূরণের আকুলতায় সে দিন রাত তার চোখের পাতা এক করেনি। প্রতিদিন প্রায় ১৫-১৬ ঘন্টা পড়াশোনা করেছে। সে পরীক্ষা দেয় এবং ৩৮ তম বিসিএস পরীক্ষায় পাশ করে বিসিএস ক্যাডার হয়। তার পরিশ্রম স্বার্থক হয়। পিতা-মাতা ও গ্রামের সবার মুখ উজ্জ্বল করে এবং নিজের স্বপ্ন পূরণ হয়। খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, প্রত্যেক মানুষের কাছেই তার স্বপ্ন পূরণের চাবিকাঠি আছে। চাবিটা সঠিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলেই সে সার্থক স্বপ্নবাজ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "জেগে ওঠো, সচেতন হও এবং লক্ষ্যে পৌঁছা পর্যন্ত থেমো না।" অর্থাৎ মহৎ ব্যক্তিদের বাণীই আমাদের অনুপ্রেরণা। বর্তমান পৃথিবীতে অনেক মহৎ ব্যক্তি আছেন, যারা স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তা পূরণও করেছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন মহৎ ব্যক্তি হলেন বিল গেটস, জ্যাক মা, মার্ক জুকারবার্গ, সাকিব আল হাসান প্রমুখ। এসব ব্যক্তিরাই আমাদের বাস্তব দৃষ্টান্ত; যারা শুধু স্বপ্ন দেখেননি, তা পূরণও করেছেন। স্বপ্ন পূরণের পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে মহৎ ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাই আমরাও জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা শুরু করি এবং নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করি যে, আমিও একদিন স্বপ্ন পূরণ করে মহৎ মানুষে পরিণত হবো। সর্বোপরি আসুন, সবাই স্বপ্ন দেখা শুরু করি, স্বপ্নময় জীবন গড়ি॥

মহান সেবক গাঙ্গুলী

তার্সিসিউস গোমেজ

প্রভু যিশু খ্রিস্টের অনুসারী হে মহান সাধক
বিনম্র শ্রদ্ধা, প্রণাম তোমায় ঈশ্বরের সেবক
সেপ্টেম্বর ২, ১৯৭৭ মহাপ্রয়াণের হে নায়ক
স্মরণে বরণে হৃদিমাঝে জাগ্রত মেষপালক।

হাসনাবাদের গাঙ্গুলী নিকুঞ্জে শুভ জন্ম তোমার
১৮ ফেব্রুয়ারি নিকোলাস
কমল ও রোমানা কমলার
ঘর আলো করে পূত পবিত্রতার
মূর্ত প্রতীক রূপে ধন্য করলে ধরিত্রী মাতার।
দিবসের তারারূপে তুমি দীপ্ত মহীয়ান
নম্র বিনয়ী মহাসাধক তোমায় জানাই প্রণাম
ত্যাগের মহীমায় সমুজ্জল সদা করি
গৌরব গান।
ঈশ্বরের সেবক অমল গাঙ্গুলী প্রভুর মহা দান।
পূজনীয় পর্যায় পেড়িয়ে হবেন ধন্য শ্রেণীভুক্ত
গাঙ্গুলী নিবাস হবে খ্রিস্টভক্তের পুণ্যতীর্থ
সেদিন বেশি দূরে নয়, আশা প্রত্যাশায়
প্রার্থনা ত্যাগ সাধনা ধ্যানে মগ্ন অবিরত।

অধীর প্রতিক্ষায় আছি রত, সমগ্র খ্রিস্টভক্ত
আশা পূরণ হলে,
প্রভুর মহিমা গান গাবো অবিরত
নিরাশ করোনা তুমি, হও না কভু বিব্রত
সাধু বলে ডাকবো তোমায় সদা জাগ্রত॥

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানীতে নতুন শিক্ষা বর্ষের উদ্বোধন ও সুবর্ণ জয়ন্তীর লোগো উন্মোচন

মাইকেল হেম্ব্রম ▯ গত ১৪ আগস্ট, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানীতে নতুন শিক্ষা বর্ষের(২০২৩-২০২৪) উদ্বোধন, নতুন শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর বরণ এবং বনানী সেমিনারীর গৌরবময় ৫০ বছর(১৯৭৩-২০২৩) সুবর্ণ জয়ন্তীর লোগো উন্মোচন করা হয়। যা ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে সেমিনারীর জুবিলী পালন করা হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, সেমিনারীর সহকারী পরিচালক ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা, শিক্ষা পরিচালক ফাদার আন্তনী হাঁসদা, আধ্যাত্মিক পরিচালক ফাদার স্ট্যানলী কস্তা, আবাসিক প্রফেসর ফাদার লেনার্ড রিবেরু, ফাদার ফ্রান্সিস মুর্মু, ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ, শিক্ষকমণ্ডলী ও বিভিন্ন গঠন গৃহ থেকে আগত মোট ২০ জন যাজক এবং ৯৭ জন শিক্ষার্থী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সকাল ৮:৩০ মিনিটে পবিত্র আত্মা ভবনের অডিটোরিয়ামে ফাদার আন্তনী হাঁসদা সকল শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বাণী রাখেন এবং নতুন শিক্ষা বর্ষের জন্য কিছু দিক-নির্দেশনা দেন। অতপর ৯টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের পূর্বে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, দুই জন নতুন শিক্ষক-ফাদার ব্রুশলি রাফায়েল লামিন (Professor-Dogmatic Theology) ও ব্রাদার সত্য রিচার্ড পিউরীফিকেশন সিএসসি (Professor-General Psychology) এবং ২৬ জন নতুন শিক্ষার্থীকে বরণ করে নেওয়া হয়। অতপর পবিত্র খ্রিস্টযাগে হয় এবং পৌরোহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ। তিনি বলেন, "এ বছর এই সেমিনারী ৫০ বছর অতিক্রম করতে যাচ্ছে। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে যাজক-প্রার্থীদের গঠনের উদ্দেশে তথা দর্শন ও ঐশতত্ত্ব অধ্যায়নের জন্য এই সেমিনারী প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেমিনারীকে উচ্চ শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশপগণ, যাজকগণ, দেশী-বিদেশী অধ্যাপকবৃন্দ, পরিচালক মণ্ডলী, বিভিন্ন গঠন গৃহের পরিচালকগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। সেমিনারীর হ্যান্ডবুক অনুসারে ৮০৫ জন শিক্ষার্থী দর্শন ও ঐশতত্ত্ব অধ্যয়ন করেছেন এবং বর্তমানে ১১৭ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছেন। এই সেমিনারী থেকে সর্বমোট ৪৩৪ জন যাজক ও কয়েকজন বিশপও রয়েছেন এবং ৮০ জন ব্রাদার ও ৫৩ জন সিস্টার তাদের শিক্ষাকার্যক্রম সুসম্পন্ন করেছেন। তারপর তিনি পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা ও লোগো উন্মোচন করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষে ফাদার রোদন হাদিমা বিশেষভাবে আর্চবিশপ মহোদয় ও সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারপর সবাই টিফিন গ্রহণ করলে যথারীতি ক্লাশ আরম্ভ হয়॥

মহাখালী লূর্দের রাণী গির্জায় প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ এবং হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান

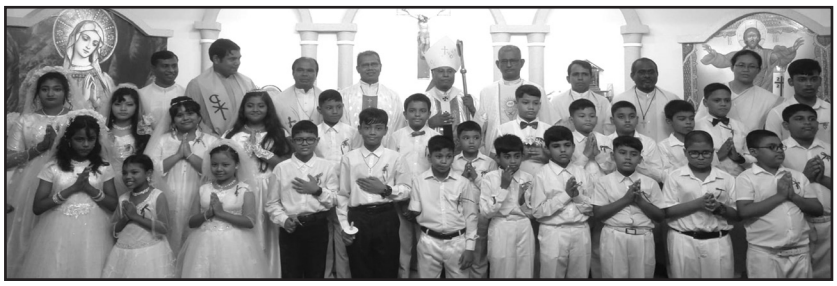

নিকোদিম ▯ গত ১১ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকার মহাখালী লূর্দের রাণী গীর্জায় এক আধ্যাত্মিকপূর্ণ পরিবেশে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ এবং হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করা হয়।

দীর্ঘ কয়েক মাস আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির পর ছেলে-মেয়েদেরকে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ এবং হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই। এতে ২৬ জন ছেলে-মেয়ে এই সংস্কার গ্রহণ করেন।

পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ। আর্চবিশপ প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণকারী ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশে বলেন, "এখন থেকে তোমরা যিশুকে গ্রহণ করবে তাই তোমরা চেষ্টা করবে সবসময় পবিত্র থাকতে।"

আর্চবিশপ বিজয় হস্তার্পণ প্রার্থীদের উদ্দেশে বলেন, "পবিত্র আত্মা যেমন প্রেরিত শিষ্যদের উপর নেমে এসেছে আর শিষ্যরা নতুন শক্তিতে প্রভুর বাণী প্রচার কাজে নিয়োজিত ছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে তোমরাও আজ থেকে যিশুকে নতুন রূপে গ্রহণ করে, নব উদ্দীপনায় জেগে ওঠ এবং পবিত্র আত্মার প্রেরণাতেই পথ চল।" আজ থেকে তোমরা হয়ে উঠেছ খ্রিস্টের বলবান সেনা এবং শিষ্য।

লরেটো সম্প্রদায়ের সিস্টারগণসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ এবং বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে অনেক খ্রিস্টভক্তরাও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

পরিশেষে ছোট্ট সোনামনিদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ এবং হস্তার্পণ সংস্কার প্রদানকারী ছেলে-মেয়েদেরকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়॥

সেন্ট লরেন্স ক্যাটিখিজম টিউটোরিয়ালের প্রতিপালকের পর্ব উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▯ গত ১০ আগস্ট, রোজ শুক্রবার ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তুইতাল পবিত্র আত্মার ধর্মপল্লীতে সাধু লরেন্সের পর্ব ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে পালন করা হয়েছে। সেন্ট লরেন্স ক্যাটিখিজম টিউটোরিয়াল তুইতাল ধর্মপল্লীর অধীনস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সাধু লরেন্সের পর্ব উপলক্ষে সকাল ১০:০০টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। এতে পৌরোহিত্য করেন স্কুলের চেয়ারম্যান তুইতাল ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার পঙ্কজ প্লাসিড রড্রিক্স। খ্রিস্টযাগের প্রারম্ভেই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষিকা ও অভিভাবকবৃন্দ শোভাযাত্রার

মধ্যদিয়ে গির্জাঘরে প্রবেশ করেন। অতঃপর বেদীতে ও সাধু লরেন্সের ছবির সামনে ধূপারতি করা হয়। উপদেশ বাণীতে পাল-পুরোহিত সাধু লরেন্সের জীবনী, মণ্ডলীতে তার অবদান ও বর্তমান বাস্তবতায় আমাদের জন্য কী কী করণীয় ও শিক্ষা হতে পারে সেই সম্পর্কে সুন্দর সহভাগিতা রাখেন। তিনি তার উপদেশ বাণীর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের দীন- দুঃখী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির প্রতি ভালবাসা ও সেবা করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। খ্রিস্টযাগের শেষে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের পরিচালনায় ক্ষুদ্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার মেরী শান্তা, এসএমআরএ তার বক্তব্যে অভিভাবক ও ছেলে মেয়েদের পর্বদিনে উৎসবমুখর দিনটির আনন্দ নিজেদের জীবনে পরস্পরের সাথে সহভাগিতা করতে অনুপ্রাণিত করেন। অনুষ্ঠানের শেষে প্রধান শিক্ষিকা উপস্থিত সকলকে সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতপর জলযোগের মাধ্যমে উক্ত পর্ব পালন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

পরপারে জর্জ সুক্লেশ কস্তা

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক ⊡ আমরা দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আমাদের অতিপ্রিয় সহকর্মী, একজন দক্ষ সমাজকর্মী, নেতা, চিন্তাশীল ও দয়াবান ব্যক্তি সুক্লেশ জর্জ কস্তা (৫২) বিগত ২০ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ভোর আনুমানিক ২:০০ টায় (১৯ আগস্ট দিবাগত রাত) স্ট্রোক করে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী রুমি তেরেজা রিবেরু ও দুই কন্যা অংকিতা কস্তা ও অর্চিতা কস্তাকে রেখে গেছেন। তার এই অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা কারিতাস পরিবারের সকল পর্যায়ের কর্মী/কর্মকর্তাগণ গভীরভাবে শোকাহত।

তিনি ছিলেন একজন দক্ষ, সৃজনশীল, নিবেদিতপ্রাণ এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সমাজকর্মী, কারিতাস বাংলাদেশ এবং স্থানীয় মণ্ডলীর এক বলিষ্ঠ নেতা। কারিতাসে চাকুরিত সময়ে তিনি কারিতাস বাংলাদেশ এবং স্থানীয় মণ্ডলীর কাজে নানাভাবে অবদান রেখেছেন। তিনি কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজের "ওয়াশ ওয়ার্কিং গ্রুপ"-এর সদস্য এবং কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজ ম্যানেজমেন্ট স্ট্যান্ডার্ডের ভিত্তিতে কারিতাস সংস্থার একজন মূল্যায়নকারী (এ্যাসেসর) হিসেবে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় সেবাদলের একজন সক্রিয় সদস্য এবং ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে বিভিন্ন কমিশনের সদস্য হিসেবে মণ্ডলীর কাজে তিনি সর্বদা একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন।

সুক্লেশ জর্জ কস্তার জন্মস্থান নাটোরের বড়াইগ্রামের অধীনস্থ ভবানীপুরের ওয়াজি ধর্মপল্লীর কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। তার শেষকৃত্যানুষ্ঠানে বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, "তিনি আমাদের সকলের খুব প্রিয় ছিলেন। তার পেশাগত কাজের পাশাপাশি মণ্ডলীর কাজেও তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি খুব সুন্দর জীবন যাপন করেছেন। তার এই অকাল প্রয়াণ আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক, আমরা তাঁর আত্মার চির শান্তি কামনা করি।"

কারিতাসের নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও বলেন, "সুক্লেশ জর্জ কস্তা কারিতাস, মণ্ডলী এবং সমাজের জন্য অনেক বড় একজন সম্পদ ছিলেন। তার মৃত্যুতে কারিতাস বাংলাদেশ এবং মণ্ডলীর এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।"

আমরা, কারিতাস পরিবারের সকলে তার বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করি এবং শোকাহত পরিবারের সদস্যদের বিশেষ করে তার স্ত্রী এবং দুই কন্যার জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা কামনা করি॥

মা-মারীয়ার জন্মতিথি ও সেনাসংঘ দিবস

আগামী ৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার মা-মারীয়ার জন্মতিথি ও **'সেনাসংঘ দিবস'**। মা-মারীয়ার জন্মদিন মারীয়ার সেনাসংঘের জন্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। তাই বাংলাদেশের সকল সেনাসংঘের সদস্য-সদস্যা ভাইবোনদের যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার জন্য ঢাকা কমিশিয়ামের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

মা-মারীয়ার জন্মদিন ও সেনাসংঘ দিবস সকলের জন্য বয়ে আনুক শান্তি সমৃদ্ধি ও মা মারীয়ার আশীর্বাদ।

ধন্যবাদান্তে,

ঢাকা কমিশিয়ামের সকল
সদস্য-সদস্যাবৃন্দ
ঢাকা, বাংলাদেশ

বি:দ্র: প্রত্যেক প্রেসিডিউম একত্রে তাদের সদস্য ও সদস্যাদের নিয়ে আনন্দের সাথে মা-মারীয়ার শুভ জন্মদিন উদ্‌যাপন করবেন।

বিজ্ঞ/২৬৭/২৩

দিদির স্বর্গযাত্রার ১৪তম বার্ষিকী

মহাকালের কাল-চক্রে আমাদের জীবনে আবারও বেদনাসিক্ত স্মৃতিময় ২৮ আগস্ট-এর আগমন হলো।

মিসেস আশালতা বটলেরু (অধিকারী)
জন্ম : ১ জানুয়ারি, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৮ আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

দিদি, তুমি ১৪ বৎসর আগে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে আমাদের কাঁদিয়ে স্বর্গরাজ্যে চলে গেছো। দিদি গো, তোমাকে ভুলিনি, ভুলতে পারছিনা, হয়তো বা কখনও ভুলতে পারবওনা। কেননা, তোমার অকৃত্রিম ত্যাগস্বীকার, স্নেহ-যত্ন, অনুপ্রেরণায় গঠিত এ জীবনে সর্বত্রই শুধু তোমার অভাব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বেঁচে আছি। দিদি, তোমার আশীর্বাদ আমার ও পরিবারের জন্য খুবই প্রয়োজন। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা তোমার রেখে যাওয়া খ্রিস্টীয় অম্লান আদর্শগুলো কর্মদায়িত্বে প্রয়োগ ক'রে তোমার স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করতে পারি। দিদি, তুমি ভাগ্যবতী যে, ইতিমধ্যেই আমাদের প্রিয় মা-বাবা তোমার সাথে স্বর্গে আছেন। বিশ্বাস করি যে, তুমি মা-বাবা'র সাথে স্বর্গে মহা শান্তিতেই আছো। অবুঝ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা, আমরাও যেন একদিন তোমাদের সাথে স্বর্গে মিলিত হতে পারি। দিদি, আজ তোমার অন্তিম বিদায় বার্ষিকীতে তোমাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। দিদি, তুমি ভাল থেকো।

তোমারই স্নেহ-ধন্য আপনজনদের পক্ষে,
ফাদার হ্যামলেট ফ্রান্সিস বট্‌লেরু সিএসসি

বিজ্ঞ/২৫৯/২৩

নিভে গেল এসএমআরএ পরিবারের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

এসএমআরএ পরিবারের একটি বিশেষ নাম, একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, সিস্টার মেরী তেরেজা। উননব্বইটি বছর ধরে পরিবার ও সংঘের আকাশে জ্বলে জ্বলে গত ২৭ আগস্ট, ২০২২, রোজ শনিবার বিকাল পৌনে তিনটায় নিভে গেল। যে নক্ষত্রটির উদয় হয়েছিল ১৯৩৩ খ্রিস্টবর্ষের ৩১ আগস্ট, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর নিভৃত এক পল্লী পিপ্রাশৈর গ্রামে। পিতা- গাব্রিয়েল কোড়াইয়া এবং মাতা - মিটিল্ডা কোড়াইয়া আদর করে নাম দিয়েছিলেন সন্ধ্যা মারীসেলিন কোড়াইয়া। যৌথ ও আধ্যাত্মিক পরিবারের ভালোবাসা এবং শাসনে বড় হওয়ার কারণে সবার প্রতি ভালবাসায় ছিলেন পরিপূর্ণ। আর তাইতো ঈশ্বর ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে ঈশ্বরের সেবা করার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে এসএসসি পরীক্ষায় পাশ করার পর তিনি প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘে ১৯৫১ খ্রিস্টবর্ষের ৪ আগস্ট সংঘে যোগদান করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ ৬ জানুয়ারি পবিত্র পোশাক প্রাপ্ত হন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ ৬ জানুয়ারি প্রথম ব্রত এবং ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ ৬ জানুয়ারি চিরব্রত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সময়ের পূর্ণতায় রজত জয়ন্তী, সুবর্ণ জয়ন্তী ও হীরক জয়ন্তী খুবই আনন্দ চিত্তে উদ্‌যাপন করেন।

প্রথম ব্রত গ্রহণের পর তুমিলিয়া প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি আইএ ও বিএ পড়াশুনা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি সেন্ট মেরীস স্কুল তুমিলিয়াতে শিক্ষকতা করেন। একই সাথে তিনি তার বিভিন্ন পড়াশুনা সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি সংঘের প্রয়োজনে তৎকালীন আর্চবিশপ গাঙ্গুলী, সিএসসির (ঈশ্বরের সেবক) পরামর্শে এবং মাদার আগ্নেশের নির্দেশনায় ফিলিপাইনে তিনবছর ঐশতত্ব বিষয়ে পড়াশুনা করেন। ফিলিপাইন থেকে পড়াশুনা শেষ করে দেশে আসার পর নব্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি একসাথে তিনটি দায়িত্ব পালন করেন। নব্যা পরিচালিকা, মাতৃগৃহের পরিচালিকা এবং সংঘের সহ সংঘ কর্ত্রী হিসেবে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তার দায়িত্ব পালন করেন। সংঘের দুর্যোগপূর্ণ কঠিন মুহূর্তগুলোতে তিনি সংঘকর্ত্রীর সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে সংঘকে নতুন রূপদানে ব্রতী ছিলেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সাতবছর নব্যাকর্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ, প্রথম বারের মত সংঘকর্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার সংঘকর্ত্রী নির্বাচিত হন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মোট ১২ বছর শক্ত হাতে সংঘের হাল ধরে সংঘকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যান। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার সহ সংঘকর্ত্রী হিসেবে আরো ৬ বছর সংঘ পরিচালনার সাথে জড়িত ছিলেন এবং একই সময়ে তিনি জুনিয়র মিস্ট্রেস হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ সন্ন্যাসব্রতী সম্মিলনীর (বিসিআর) প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে সেবা দিয়েছেন। পরপর দুইবার এ সেবা কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন।

শ্রদ্ধেয়া সিস্টারের জীবনের দিকে তাকালে দেখি তিনি সত্যিই সংঘের জন্য ছিলেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, এক শক্ত পিলার। জীবনের বেশীর ভাগ সময় তিনি মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে সংঘে তার সেবাদায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি নিজের জীবন যেমন খুব সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছেন তেমনি মাতৃযত্নে অনেক সিস্টারকে গঠন দিয়েছেন একজন সন্ন্যাসব্রতী হিসেবে গড়ে উঠতে। একজন আদর্শ নব্যা পরিচালিকা হয়ে তিনি নব্যাদের জীবন অনুপ্রাণিত করেছেন, তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছেন, আলোর পথে চলতে অনুপ্রাণিত করেছেন। একইভাবে একজন সুদক্ষ নাবিকের মত সুদীর্ঘ ১২ বছর তিনি শক্ত হাতে সংঘের হাল ধরেছেন। যার উপর ভিত্তি করে সংঘ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে গিয়েছে। একজন আধ্যাত্মিক পরিচালক, অভিভাবক, ভালোবাসার মানুষ হিসেবে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতা, সুবিবেচনা, ও পরিণামদর্শিতার সাথে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি। যিনি এক বটবৃক্ষ হয়ে সংঘের কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিকতাকে হাতিয়ার করে একতা ও ভালোবাসার পথে এগিয়ে চলতে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

এরপর তিনি ১৯৯৫ থেকে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২০ বছর মাতৃগৃহে অবস্থান করে শান্তি ভবনের পরিচালিকা হিসেবে বয়োজ্যেষ্ঠা ও অসুস্থ ভগ্নিদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। এ সময় তিনি খুবই আন্তরিক ও যত্নশীল হয়ে ভগ্নিদের সেবা করেছেন, ঐশসান্নিধ্য লাভের জন্য ভগ্নিদের প্রস্তুত করেছেন যার জন্য তিনি হয়ে উঠেছিলেন শান্তি ভবনের 'মা'।

এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়ার পর তিনি মাতৃগৃহে থেকে সংঘের জন্য নীরবে বিভিন্নকাজ করে গেছেন যেমন- সিস্টারদের রেকর্ড সংরক্ষণ, উলের কাজ, বিভিন্ন হাতের কাজ, সেলাই ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি দীর্ঘদিন অন্যান্য সেবা দায়িত্বের পাশাপাশি জাগরণী হস্তশিল্পের সাথে যুক্ত থেকে তাদের সহযোগিতায় গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য তাদের নিয়ে দল গঠন করে পাট শিল্পের কাজ পরিচালনা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে গ্রামের দরিদ্র মহিলারা বেঁচে থাকার আশা খুঁজে পায়। অত্যন্ত হতদরিদ্র অবস্থা থেকে মুক্তির পথ পায় এবং সন্তানদের লেখাপড়া করানোর সুযোগ পায়। শ্রদ্ধেয়া সিস্টার যতদিন সচল ছিলেন ততদিন তিনি তার সাধ্যমত সংঘে সেবাদান করেছেন । বিশেষ করে তিনি তার প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার, বার্ধক্যজনিত কারণে যে শারীরিক কষ্ট তা উৎসর্গ করেছেন সংঘের মঙ্গলের জন্য। অতপর তিনি প্রায় তিন মাস ধরে গুরুতর ভাবে অসুস্থ থাকার পর গত ২৭ আগস্ট, পিতার অন্তিম ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গবাসী হন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন প্রার্থনাশীল মানুষ। প্রার্থনার শক্তি নিয়ে তিনি তার বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। সংঘের নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি সিস্টার ছিলেন যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। নিজেও নিয়মকানুন পালন করতেন এবং একজন পরিচালক হিসেবে সবাইকে কঠোরভাবে তা পালনে উৎসাহিত করতেন ও পরামর্শ দিতেন। তিনি সবসময় Community Spirit অর্থাৎ পারস্পরিক সম্প্রীতির কথা বলতেন, সংঘবদ্ধ জীবনে পারস্পরিক ভালবাসা, ক্ষমা, মিলনের কথা বলতেন। তিনি একান্তভাবে চাইতেন যেন সংঘের মধ্যে ভগ্নিদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর হয়, আমরা যেন পরস্পরকে গ্রহণ করি, বুঝি, সমর্থন দেই। তিনি সংঘকে নিজের চাইতেও বেশী ভালবাসতেন। তিনি চাইতেন যেন আমরাও সংঘকে ভালবাসি এবং সংঘের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যাই। অসুস্থতার সময়েও যতক্ষণ তিনি চেতনায় ছিলেন ততক্ষণ তিনি সংঘকে ভালবাসার, পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষার, মিলন ও ভ্রাতৃত্বের কথা বলে গেছেন। তার এই অসুস্থতার সময়েও অনেকবারই তিনি সংঘের কর্তৃপক্ষ ও আমাদের আশীর্বাদ দিয়েছেন এবং - সংঘের ক্যারিজম, ঐতিহ্য, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য যেন আমরা ভুলে না যাই সেই পরামর্শও দিয়েছেন।

শ্রদ্ধেয়া সিস্টার মেরী তেরেজা আমাদের জন্য ছিলেন এক আদর্শ ও অনুপ্রেরণার উৎস। তার মনন-ধ্যান, চিন্তা-চেতনা এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনে সুশৃঙ্খল মনের অধিকারী। তাইতো ঈশ্বর তাকে নীরবতায় তুলে নিলেন তাঁরই একজন করে। মৃত্যুর পূর্বদিন অনেকের আগমনে, সাক্ষাতে তিনি ছিলেন খুবই উৎফুল্ল এবং আনন্দিত। তার মুখাবয়বে ফুঁটে উঠেছিল এক উজ্জ্বল আলো যে আলোটি ধীরে ধীরে অনেকের উপস্থিতিতে নীরবে নিভে গেল। শ্রদ্ধেয়া সিস্টারকে হারিয়ে আমরা সবাই শোকাহত ও মর্মাহত। আমরা শ্রদ্ধেয়া সিস্টারের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে প্রার্থনা করি যেন স্বর্গ থেকে আমাদের উপর আশিসবারি বর্ষণ করতে পারেন।

বিজ্ঞ/২৫৫/২৩

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ৩০
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 30
Regd. No. DA-33
❖ 27 August - 2 September, 2023, ১২ - ১৫ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

স্মৃতিতে অম্লান তুমি, তোমায় মোরা নমি

সিস্টার মেরী তেরেজা এসএমআরএ

এসএমআরএ পরিবারের পক্ষ থেকে তোমার প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

"তোমার প্রেমের পথে যারা চলেছিল আজীবন,
তারাই যে আজ ফুলের মতো সবার আপনজন।
ধন্য তারা ধন্য, সবার কাছে অনন্য।"

বিজ্ঞ/২৫৫/২৩

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, 01798-513042, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org